শ্রীআশীষ গুপ্ত

ইহাই নিয়ম

ইহাই নিয়ম

অন্তরে বাহিরে

স্বামী-তীর্থ

বরণডালা

বিদ্রূপ

এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়
৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

সরস্বতী লাইব্রেরী
৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মুদ্রাকর
শ্রীরজনীকান্ত রাণা
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড্
১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সামতাবেড়, পাণিত্রাস
হাবড়া।

প্রিয় উপেন,

তোমার চিঠি পেলাম। শ্রীমান আশীষ গুপ্তের গল্পের বই 'ইহাই নিয়ম' মন দিয়ে পড়েচি। এর ভাষা যেমন ঝরঝরে, লেখার ধরণটিও তেম্‌নি ভালো। সব কটি গল্পই আমাকে আনন্দ ও তৃপ্তি দিয়েছে। এই লেখকের ভবিষ্যৎ যে সত্যই উজ্জ্বল এবং আশাপ্রদ একথা আজকালকার দিনে অকপটে বল্‌তে পারায় মন খুশি হয়ে ওঠে। দেহটা মোটেই ভালোভাবে চল্‌চে না। তোমার কেমন ?

ইতি ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ তোমাদের শরৎ

—বাংলার ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক বিচিত্রা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত পত্রাংশ— —

এই পুস্তকান্তর্গত গল্পগুলি ইতিপূর্ব্বে 'বিচিত্রা', 'প্রবাসী' ও 'বঙ্গলক্ষ্মী'তে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

পিতৃদেবের শ্রীচরণোদ্দেশে

ইহাই নিয়ম

যে নৈতিক সাহস সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কথা পুস্তকে লেখা আছে, সেই সাহস দেখাইতে গিয়াই বিভ্রাট বাধিল। সোমবার দিনের বেলা সাড়ে-দশটা,—অরিন্দম আফিসে আসিয়া নিজের চেয়ারটিতে বসিল, ক্রিং করিয়া ঘণ্টা বাজাইল, বেয়ারা আসিয়া সেলাম ঠুকিলে তাহাকে অনাবশ্যকভাবে মিনিট তিন-চার দাঁড় করাইয়া রাখিল, পা দুইটা টান্ করিয়া টেবলের তলায় ছড়াইয়া দিল, হাতের আঙুল মট্‌কাইল, আলস্য ভাঙিল, শেষে বলিল, "পেটি এ্যাকাউণ্টস্ ফাইল—"

কি শান্তি! কি গৌরব! মাথার উপরে পাখাটা পুরা জোরে ঘুরিতেছে, পাঁচটা পর্য্যন্ত ঘুরিবেও।—অরিন্দম মনে মনে হিসাব করে, মাসে কত বিদ্যুৎ খরচ হইবে, কত টাকার বিল হইবে এই পাখাটার জন্য!

চারিটা টেবল্ দূরে হরিশবাবুর চেয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া জন কয়েক কেরাণী নিম্নস্বরে কি যেন একটা বলাবলি করিতেছিল। অরিন্দম উঠিয়া দাঁড়াইল, নিকটে আসিয়া বলিল, "কি মশাই, কিসের আলোচনা হচ্চে ?"

"যোগেনকে হামফ্রিজ্ সাহেব জবাব দিয়েছে।"

"জবাব দিয়েছে কি রকম ?—তার অপরাধ ?"

"শনিবার দিন ড্রয়ারের ভিতর নভেল রেখে পড়্ছিল।"

অরিন্দম বুকটা টান করিয়া হাত দুইটা পকেটে পূরিয়া দিল; মনে হইতেছিল সে-ই যেন হামফ্রিজ্ সাহেব। জিজ্ঞাসা করিল, "তার হাতে কোন কাজ ছিল তখন ?"

"না।"

"আফিস ছুটি হ'বার আর কতক্ষণ বাকী ছিল ?"

"আধঘণ্টা।"

"তখন আর নূতন কোন কাজের ভার তার হাতে দেওয়ার সম্ভাবনা তাহ'লে একেবারেই ছিল না ?"

"নিশ্চয়ই না।"

"তাকে জবাব দেওয়া হ'য়েছে কখন ?"

"সাহেব তাকে সেই দিনই ডেকে নিয়ে গিয়ে অনেক ধমক-ধামক করেছিল,—আজ আফিসে এসে বস্তেই বেয়ারা তার

হাতে একটা স্লিপ্ দিয়ে গেল ; হ্যামফ্রিজ শনিবার দিনই লিখে রেখে গিয়েছে,—যোগেনের আর আফিসে আসার প্রয়োজন নেই,—এক মাসের মাইনে সে এম্‌নিই পাবে। কোম্পানীর চাকরী তার মতন দায়িত্বজ্ঞানহীন ফাঁকিবাজ লোকের জন্যে নয়।”

অরিন্দম কহিল, “এটা অন্যায়, তাকে ওয়ার্ণিং দিয়ে দিলেই যথেষ্ট হ’ত।”

হরিশ কহিলেন, “এই বল ত ভায়া, আমিও সেই কথাই এদের বল্‌ছিলাম। বেচারা যোগেন,—ওকে আমি এর আগে কতদিন বলেছি, নভেল-টভেল পড়্‌বি ত পড়্, কিন্তু আমার কাশিটার দিকে একটু কান রাখিস্। দরজার কাছে বসি,—তোদের এই সামান্য উপকারটুকুও যদি আমার দ্বারা না হয়, তাহ’লে শুধু শুধুই এতগুলো বছর এখানে ভূতের বেগার খাটছি। কিন্তু কাশি ত কাশি, কানের কাছে কামান দাগ্‌লেও বোধ হয় ওর নভেল পড়ার সময় চৈতন্য হয় না। কিছু বল্‌লে বলে, সমস্ত কাজ শেষ করে’ তবে ত বই পড়ি,—আমার কোন্ কাজে কোনদিন ত্রুটি দেখেছেন?—আর ত্রুটি! হ্যামফ্রিজ এসে বইখানা ধরে’ যখন টান্‌ল, ও তখন বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই সাহেবের হাতটা সরিয়ে দিয়ে বল্‌ল, ‘আরে যাও যাও, সব সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না।’ সাহেব যেই ঘোঁৎ করে’ চীৎকার করে’ উঠ্‌ল, ‘হোয়াট্’, অম্‌নি যোগেনের চোখ উপর দিকে তাকিয়েই কিছুক্ষণের জন্যে স্থির হ’য়ে গেল।—আমরা

ডেপুটেশান পাঠাব ভায়া,—যোগেনের জন্তে আমাদের কিছু করা উচিত,—আর বিনা ওয়ার্ণিং-এ এত সহজে যদি চাকরী যায়, তাহ'লে ত পারা যায় না।"

অরিন্দম কহিল, "আমি রাজী আছি;—এ রকম অন্যায়ের একটা প্রতিকার হওয়া দরকার। চলুন আগে আমরা সাহেবের কাছে যাই, তারপর খবরের কাগজে চিঠি লিখ্‌ব। ডেপুটেশানে কাকে কাকে নিতে চান্‌?"

হরিশ কহিলেন, "আমি, সুধীর, প্রমথ, অবনীশ, আর তুমি। তোমাকেই লীডার হ'তে হ'বে, ভায়া—বল্‌তে কইতে পার, ইংরেজীটার ওপরও একটু দখল আছে,—তোমার পিছনে আমরা থাকব।"

অরিন্দম বলিল, "বেশ তাই হ'বে,—যখন যাওয়া স্থির কর্‌বেন আমায় জানাবেন।" বলিয়া নিজের জায়গায় গিয়া বসিল।

হরিশ ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে, হামফ্রিজের আসার সময় প্রায় হ'ল, যে যার কাজে যাও।"

বারোটার সময় ডেপুটেশান হামফ্রিজের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। সর্ব্বাগ্রে অরিন্দম বুক ফুলাইয়া চলিল। গতকল্য পার্কে-শোনা বক্তৃতাটার প্রায় সব কথাগুলাই মনে আছে। সমস্ত শরীরের আগুনের ফুলকিগুলা যেন দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে,

বাংলাদেশ অতিক্রম করিয়া, ভারতবর্ষ পার হইয়া বিশাল পৃথিবীতে সেগুলা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে; মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া দিবে বলিয়াই অরিন্দমের বিশ্বাস। গতকল্য বৈকালে পার্কের বেঞ্চির উপরে দাঁড়াইয়া বক্তৃবৃন্দও সেই কথাই বলিয়াছিলেন।

হামফ্রিজের ঘরের কাছে আসিয়া হরিশ অরিন্দমকে কহিলেন, "তুমি প্রথমে যাবে, আমরা পৃষ্ঠরক্ষা করব,—যুদ্ধের যা নিয়ম। যা বল্‌বার তুমিই বল্‌বে, দরকার হ'লে আমরা তাল দিয়ে যাব।"

একটা কাগজে নিজের এবং চাকুরীর নাম লিখিয়া বেয়ারার হাতে দিয়া, অরিন্দম দলবলসহ হামফ্রিজের ডাকের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আগুনের ফুল্‌কিগুলার সংখ্যা যেন কমিয়া আসিতেছে,— সবগুলা কি সর্ব্বদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে নাকি? পা দুইটা থর্‌থর করে,—বুকের ভিতরে টিপ টিপ শব্দ হইতেছে,—যুদ্ধের দামামাধ্বনি বলিয়া ত বোধ হয় না! জিভ্‌টা শুকাইয়া উঠিতেছে, রণশ্রান্ত সৈনিকের জিভের মতন।—অরিন্দমের মনে হইতে লাগিল যেন এক বৎসরের ভিতর সে জলস্পর্শ করে নাই!

হামফ্রিজ্‌ সাহেব ডাকিয়া পাঠাইলে অরিন্দম ঘরে ঢুকিল। তাহার দুই চোখের দৃষ্টি তখন যথেষ্ট পরিমাণে ঘোলাটে হইয়া উঠিয়াছে!

সাহেব কহিল, "ইয়েস—?"

প্রাণান্তকর চেষ্টায় অরিন্দম বলিল, "সাহেব, যোগেনকে ডিসমিস করা উচিত হয় নি,—তাকে অন্ততঃ একটা চান্স—"

সাহেবের চোখ-মুখ লাল হইয়া উঠিল।—অরিন্দমের সন্দেহ হইল যে, ইহা বোধ হয় তাহার প্রতি হামফ্রিজের সুনিবিড় প্রীতির লক্ষণ নহে। সে পিছন দিকে চাহিয়া, হরিশ অথবা অন্য কাহাকেও ঘরের ভিতরে দেখিতে পাইল না। তাহারা বোধ হয় বাহিরে দাঁড়াইয়া, অথবা নিজের নিজের জায়গায় বসিয়া পৃষ্ঠরক্ষা করিতেছিল। আর এসব ক্ষেত্রে 'পৃষ্ঠ' যে কতদূরে অবস্থিত সে সম্বন্ধে কোন ধরা-বাঁধা মাপ-জোক নাই।—সেইজন্য নিজের চেয়ারটিতে বসিয়াও বলা চলে, "পৃষ্ঠ রক্ষা করিতেছি"—এবং হরিশের দলকে তজ্জন্য দোষ দেওয়া যায় না।

হামফ্রিজ চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ক্লিয়ার আউট্—" টেব্‌লের উপর একটা প্রচণ্ড চাপড় মারিয়া বলিল, "আই সে, ক্লিয়ার আউট্, ইউ—"

অরিন্দম দ্রুতকম্পিতপদে দরজার দিকে অগ্রসর হইল। একটা চেয়ারের কোণে পাঞ্জাবীর পকেটটা আট্‌কাইয়া চেয়ারটা উল্‌টাইয়া গেল,—পকেটটা বোধ হয় ছিঁড়িয়াছে! তাড়াতাড়ি স্প্রিং-এর দরজা ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই মনে হইল যেন পায়ের তলার হারানো-মাটিটা আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে! অরিন্দম পকেট হইতে রুমাল বাহির করিল,—ডানদিকের পকেটটা একেবারেই

গিয়াছে, উপর হইতে নীচ অবধি দুইখণ্ড হইয়া দুই দিকে ঝুলিতেছে। নূতন জামাটা,—চাকরী আরম্ভ করিবার মাত্র সাতদিন পূর্ব্বে কেনা!

অরিন্দম মুখটা ভালো করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া নিজের চেয়ারে গিয়া বসিল। ডেপুটেশানের অন্যান্য মেম্বারদের দুর্নিবার কৌতূহল কোনদিকে না তাকাইয়াও সে অনুভব করিতে পারিতেছিল। হরিশ কহিলেন, "তোমার সঙ্গে একগাদা লোক গিয়ে তোমাকে এম্‌ব্যারাস্‌ করে' লাভ নেই ভায়া,—ডেপুটেশানের লীডারকেই প্র্যাক্‌টিক্যালী ডেপুটেশান বলা চলে,—সেই জন্যেই ঘরে ঢুক্‌লাম না হে। আমাদের মর‍্যাল সাপোর্টের দাম তাই বলে' কিছু কম নয়,—তোমাকে এন্‌কারেজ কর্‌বার জন্যে—"

বেয়ারা আসিয়া অরিন্দমের হাতে এক টুক্‌রা কাগজ দিল,—অরিন্দম পুনরায় সাহেবের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার দশ মিনিট পরে ক্যাশিয়ারের নিকট হইতে পঁয়তাল্লিশটা টাকা লইয়া একেবারে সদর রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

হরিশ তখন ডেপুটেশানের অন্যান্য মেম্বারদিগের কাছে বলিতেছে, "সাত বছরের সার্ভিস হ'ল আমার এখানে।—তার ভিতরে দু' দুটো সাহেবকে পার করেছি,—কিন্তু এ-রকম

বদ্‌মাইস্‌— যাই হোক্‌, ছোকরা খুব মর‍্যাল কারেজ দেখিয়ে গেল কিন্তু—"

অরিন্দমের শূন্য কেদারার উপর পাখাটা পূরা জোরে ঘুরিতেছে ;—মাসের শেষে একটা মোটা টাকার বিল হইবে বোধ হয় !

অনেক কষ্টের চাকরী,—তিন জোড়া নূতন টায়ার-সোলের জুতার সোলগুলা সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হইয়া যাইবার পর জুটিয়াছিল। ইহার জন্য তাহাকে দুই তিনটা পরীক্ষাসাগর উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে। তাহাকে বলা হইয়াছিল, শত্রুসৈন্য তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, পালাইবার চার পাঁচটা রাস্তা আছে,—প্রতি রাস্তার সুবিধা অসুবিধাগুলি বিশদভাবে তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল,—সে কোন্‌ রাস্তা দিয়া পলায়ন করিবে।

অরিন্দম কপাল ঠুকিয়া একটা রাস্তার নাম করিতেই প্রশ্নকর্ত্তা সাহেবটি বলিয়াছিলেন, "হইল না। যুদ্ধক্ষেত্রে বসিয়াই ভগবানের নিকট তোমার প্রার্থনা করা উচিত যেন তিনি শত্রুসৈন্যদলের অন্তঃকরণে শুভ ধর্ম্মবুদ্ধি এবং অহিংস ভাব জাগরিত করেন, তাহা হইলেই তুমি বাঁচিবে। অনন্ত করুণাময় পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন ?"

সাহেবটিকে পাদরী বলিয়াই অরিন্দমের বিশ্বাস হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ধারণা সম্পূর্ণরূপে ঠিক না-ও হইতে পারে।

তাহাকে Szekesfchervar জায়গার নামটি নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করিতে বলা হইয়াছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, 'টিটিকাকা' কোথায়, 'আত্মশ্রাদ্ধ রোড' কোথায়? সে জানিত না, আন্দাজী উত্তর দিয়াছিল,—সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়াছিলেন। অরিন্দম মনে মনে বুঝিল যে, চাকরীর আশা ভরসার আত্মশ্রাদ্ধও সঙ্গে সঙ্গে হইয়া গেল। কিন্তু 'অনন্ত করুণাময় পরমেশ্বর' ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন! সাহেব হঠাৎ একটা এক পয়সা দামের তারের ধাঁধা বাহির করিয়া কহিলেন, "এটা খুলিতে পার?"

মরিয়া হইয়া অরিন্দম সেটা লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল,—কোথা দিয়া যে সেটা কখন কেমন করিয়া খুলিয়া গেল, তাহা সে টেরও পাইল না। কিন্তু তাহার পরীক্ষক নিমেষে সন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন, কহিলেন "তুমি পারিবে।" কি পারিবে কে জানে! তবে আপাততঃ ত সে 'টিটিকাকা'র দায় হইতে রক্ষা পাইয়া বাঁচিয়া গেল।

ইহার নাম সাধারণ জ্ঞান! অন্ততঃ প্রশ্নকর্তা সাহেবটি তাহাই বলিতে চাহিয়াছিলেন। অরিন্দম ঠিক বোঝে নাই যে, কেরাণীগিরির সহিত এইগুলার প্রকৃত সম্বন্ধটা কি। কিন্তু সে ত অনেক কিছুই বোঝে না, এবং তাহার না-বোঝার জন্য বিশেষ কিছু যায়-আসে না।

তাহার পর একদিন ডাক্তার তাহার চোখ দেখিল, জিভ টানিল, পেট টিপিল, হার্ট পরীক্ষা করিল; শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার প্রপিতামহ কি রোগে মারা গিয়াছিলেন?"

অরিন্দম জানিত না, বর্ত্তমান জগতের কেহই সে-সংবাদ জানে না,—কিন্তু তাহাতে কিছু আট্‌কায় না; এক পক্ষ যখন ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা শুনিতে চাহে, তখন অপরপক্ষের উত্তরদানে বিলম্ব করা ত উচিত নয়ই, বোধ হয় ভদ্রতাসঙ্গতও নয়।

—এত কাণ্ডকারখানা করিবার পরেও কেবলমাত্র সহি সুপারিশের জোরেই চাকরীটা জুটিয়াছিল,—মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাহিনায়, সেটিও গেল।

গত কল্যকার পার্কে-শোনা বক্তৃতাটা মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে।

বেঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া লোকটা বলিয়াছিল, "হে তরুণ, আজ সর্ব্বস্ব ছেড়ে, সমস্ত লাভের আশা ত্যাগ করে' সর্ব্বহারার বেশে পথে বেরিয়ে এস। চারটি করে' অন্ন খেয়ে জীবন-ধারণ করাই কি তোমাদের জীবনের চরম সার্থকতা হ'বে? তিরিশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরিই কি তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হ'বে?—হে তরুণ, হে দেশের ভবিষ্যৎ ভরসাস্থলীয় যুবকবৃন্দ, হে অনাগত কালের নাগরিক, ওঠ, জাগ,—আজ

পথের ডাক কান পেতে শোন,—চাকরীর মোহ, দাসত্বের মোহ, কোন-রকমে-বেঁচে-থাকবার মোহ, সকল ছাড়িয়ে, সর্ব্বধ্বংসী স্নেহের বাধা এড়িয়ে সর্ব্বরিক্ততার বেশে বা'র হ'য়ে এস।—"

—নাঃ, লোকটা বলিতে পারে বটে,—হাত নাড়িয়া, পা নাড়িয়া, বিচিত্র মুখভঙ্গী করিয়া যেন আগুন ছুটাইয়া দিল। সভার সমুদয় শৃঙ্খলা-রক্ষার এবং বক্তা-সংগ্রহের প্রধান ভার ছিল সুবোধের উপর। সে অরিন্দমের কানে কানে কহিল, "দশ টাকা চেয়েছিল এক ঘণ্টার জন্যে,—অনেক দরকষাকষি করে' তবে আট টাকায় নিমরাজী করান গেছে। যে রকম বল্‌লে তাতে টাকাটা সার্থক হ'বে, কি বলিস?"

অরিন্দম মাথা নাড়িয়া সায় দিয়াছিল; মনে মনে হিসাব করিয়াছিল, ঘণ্টায় আট টাকা রোজগার হইলে সাড়ে-দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কত হইতে পারে, তিরিশ দিনে গিয়া কত দাঁড়ায়,—"সর্ব্বরিক্ত, সর্ব্বহারা" গোছের কোনও একটা সংখ্যা বোধ হয় নহে!

কিন্তু খাসা বলিয়াছিল লোকটা!

অরিন্দম জোরে জোরে পা ফেলিয়া ফুটপাথের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। সে তরুণ, তরুণ হইতে হইলে এক দামড়িও খরচ করিতে হয় না,—মানবজন্ম পরিগ্রহ করিলেই একদিন না একদিন তরুণ হইতে পারা যায়,—যদি না এই জীর্ণ দেহের মায়াটা তৎপূর্ব্বেই ছাড়িয়া যাইতে হয়। অথচ এই তরুণরাই

নাকি পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করিয়া চলে! অরিন্দম ভাবিতেছিল, সেই ইতিহাস হয়ত সে-ই বানাইবে। কে জানে!

মনে মনে সে আবৃত্তি করিতে লাগিল, "আমি আমার কর্ত্তব্য করিয়াছি,—চাকরী গিয়াছে তাহার জন্য দুঃখ নাই—" কিন্তু জোর পাইল না, কেমন যেন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল,—মনে হইল, বাজে কথা, শুধু ফাঁকি,—গর্ব্ব করিবার মতন কিছু ঘটে নাই, লজ্জা করিবার মতন ঘটিয়াছে।

চাকরী সুরু করিবার সময় মাতা কহিয়াছিলেন, "কাজ আরম্ভ কর্‌বার আগে বিয়েটা করে' নিলে পার্‌তিস্, অরু। পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের চাকরী করিস্, একথা শুন্‌লে কেউ ত বেশী টাকা দিতে চাহিবে না,—তার চাইতে কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরী-বাকরীর মতলব কর্‌ছিস্ বল্‌লে, ঢের বেশী টাকা পাওয়া যেত।"

কথাটার যুক্তি অরিন্দম অস্বীকার করে নাই। জলের কাৎলা যতদিন জলে থাকে ততদিন পর্য্যন্ত এ কথা সকলেই বিশ্বাস করে যে, সেটা বাড়িতে থাকিবে, এবং বাড়িতে বাড়িতে সেটা যে কত বড় পর্য্যন্ত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে জোর করিয়া কেহ কিছু বলে না;—কিন্তু সেটাকে ডাঙ্গায় টানিয়া তুলিলেই তাহার আয়তনের সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হইয়া যায়,—ইহা ত সকলেই জানে। কিন্তু তবুও অরিন্দম বিবাহে

আপত্তি করিত। বিবাহ সম্বন্ধে সুদৃঢ় কোন মতামত পোষণ করিত বলিয়া যে তাহার আপত্তি, তাহা নহে। তাহার আপত্তি অনেকটা আপত্তি করিবার জন্য, এবং সে বলিতে চাহিত যে, সে আধুনিক, অতএব নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে না পারিলে সে বিবাহ করিবে না।

কিন্তু কোন আপত্তিই আর এবার টিকিল না। এবং পাছে আবার অরিন্দমের চাকুরী জুটিয়া যায়, এই ভাবনায় জননী অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

শুভদিনে অরিন্দমের শুভ বিবাহ হইয়া গেল। দুই হাজার টাকা নগদ এবং গহনা, দানসামগ্রীসহ নববধূ কল্যাণীকে লইয়া অরিন্দম গৃহে ফিরিল। মাতা আর বিলম্ব করিলেন না;—নব বধূর গহনা, দানসামগ্রী এবং পণের টাকা সমান দুইভাগে ভাগ করিয়া, নিজের অবশিষ্ট কন্যা দুইটিকে মাসখানেকের ভিতরেই দুইটি ডাঙ্গায়-তোলা কাৎলার হস্তে সমর্পণ করিলেন,—কিন্তু কাৎলাদের বোধ হয় হস্ত থাকে না, অতএব গলায় গাঁথিয়া দিলেন বলাই ভাল।

দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ফুটপাথগুলা তাতিয়া আগুন হইয়া আছে। পিচ-ঢালা রাস্তার উপর দিয়া থার্ডক্লাশ ঘোড়ার গাড়ীগুলা চলিতে

শব্দ হয় না,—এই একটা সুবিধা,—কিন্তু যে উত্তপ্ত হাওয়া সেখান হইতে উঠিতে থাকে, তাহার কাছে তরুণবাহিনীর ভিতরকার অগ্নি খুব সম্ভব পাত্তা পায় না।

অরিন্দম ফুটপাথ দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছিল, দ্রুতপদে নহে, ধীরে ধীরে।—প্রকাণ্ড আফিস-বাড়ী, গোটা পঁচিশ আফিস বোধ হয় সেই বাড়ীটার মধ্যে আছে,—খুব কম করিয়া ছয় শ' লোক সেই বাড়ীটায় কাজ করে।—অরিন্দম লিফ্‌টে গিয়া চড়িল। লিফ্‌টম্যান তাহার পোষাক পরিচ্ছদের দিকে তাকাইয়া রহিল,—মনে মনে হয়ত ভাবিতেছিল, তাহাকে নামিয়া যাইতে বলিবে কি না। লোকটার ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া অরিন্দমের কান পর্য্যন্ত লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, লিফ্‌ট্‌ হইতে নামিয়া, সে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

দরজার গায়ে পিতলের প্লেটগুলা ঝক্ ঝক্ করিতেছে, উর্দ্দিপরা চাপরাস-আঁটা বেয়ারাগুলা চলাফেরা করে,—যেন কত মস্তবড় এক একজন ব্যক্তি অত্যন্ত ব্যস্ত রহিয়াছেন! ভিতরে টাইপরাইটার মেসিন্‌গুলার খটাস্ খটাস্ শব্দ, দুই একটা দরজায় বড় বড় ইংরেজী অক্ষরে লেখা,—'নো ভেকেন্সি'।

কোনও আফিসে একটা কাজের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। অরিন্দম তাহারই দরজার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। টুলের উপর

বসিয়া একটা চাপরাসী ঝিমাইতেছিল, চোখ মেলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, 'কেয়া মাঙ্গ্‌তা ?'

পকেট হইতে এক টুক্‌রা কাগজ বাহির করিয়া নিজের নামটা লিখিয়া দিয়া অরিন্দম বলিল, "বড়বাবুকে দিয়ে দাও।"

কিছুক্ষণ পরে লোকটা ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে ভিতরে যাইতে বলিল।

ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে অরিন্দম মনে মনে বলিতে থাকে, একদিন আমিও আফিসে কাজ করিয়াছি। ঘণ্টা আমিও বাজাইতাম, চাপরাসী আমায়ও সেলাম ঠুকিত। আজই আমার কাপড় জামাগুলায় ঘামের গন্ধ হইয়াছে, এত কালো হইয়াছে এইগুলা আজকালই, কিছুদিন আগেও এমনটি ছিল না।—কিন্তু মনটা আবার গ্লানিতে ভরিয়া উঠে।

—"কি চাই আপনার ?"

গুটি দশেক লোক বড়বাবুর টেব্‌লের আশপাশে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের দিকে চাহিয়া অরিন্দমের মনে হইতে লাগিল যেন আয়নাতে নিজের মুখ দেখিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মুখে এবং চেহারায় নিদারুণ অসহায়তা এবং কাতরতার এমন একটা ছাপ মারা ছিল যে, লক্ষ লোকের মধ্য হইতেও তাহাদিগকে চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না।

অরিন্দম বলিল, "আপনাদের আফিসে চাকরী খালি আছে শুন্‌লাম,—আমি সেইজন্যেই একটু চেষ্টা করিতে চাই। আমি একজন গ্র্যাজুয়েট,—আগে চাক্‌রী কর্‌তাম, এই আমার সব

টেষ্টিমোনিয়্যালস্”—বলিয়া সে পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিল।

সেইগুলার দিকে চাহিয়া বড়বাবু চোখের চশমাটা খুলিয়া ফেলিলেন, কোঁচার খুঁটটা দিয়া কাঁচগুলা পরিষ্কার করিতে করিতে কহিলেন, “কোত্থেকে যে এসব উড়ো খবর আপনারা পান্, তা আপনারাই জানেন।—আজ সকাল থেকে আরম্ভ করে কম্‌সে-কম একশ’ লোক আমাকে এসে বিরক্ত করেছে,—আফিসে ঢুকে অবধি আজ একবার কলম ছুঁতে পারিনি। না মশাই, চাকরী-টাক্‌রী আমাদের এখানে খালি নেই। চাকরীর বাজার আজকাল এত সস্তা নয়। কত বি-এ, এম্-এ পাসকরা লোক রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায় একটা যা-তা কাজের জন্যে।—আচ্ছা আপনারা তাহ’লে এখন যেতে পারেন।”

অরিন্দম এবং অন্য লোকগুলা বাহির হইয়া আসিল,—পিছনে বড়বাবু হাঁকিয়া বলিলেন, “বেয়ারা দরওয়াজামে ‘নো ভেকেন্সি’ বোর্ড লাগাও।”

তাহারা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল। সময়ের ভাবনা নাই, অফুরন্ত পড়িয়া আছে, কিসে খরচ করিবে ভাবিয়া পায় না। খানিকক্ষণ পাঁচতলা পর্য্যন্ত নামা ওঠা করিলে তবু যাহ’ক একটা কাজের সন্ধান মেলে,—লিফটে চড়িয়া তাড়াহুড়া করা নিষ্প্রয়োজন।

বড়বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন; ঘণ্টা বাজাইয়া বেয়ারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকগুলি চলিয়া গিয়াছে কি না।

তাহার পরে উঠিয়া আফিসের ছোট অংশীদার ব্র্যাড্‌লী সাহেবের ঘরে গেলেন। কহিলেন, "স্যার, সকালবেলা আপনাকে আমার জামাইটির কথা বলেছি,—খাসা ছেলে,—আমাদের আফিসের জন্যে যেমনটি দরকার ঠিক তেমনি। গ্র্যাজুয়েট দিয়ে আমাদের কোন দরকার নেই,—এটা ত কলেজ নয়, আঁফিস।—আমার জামাইটি পাস্-টাস্ কিছু নয়,—কিন্তু প্র্যাক্‌টিক্যাল নলেজ অসাধারণ। আমি ওকে ঠিক তৈরি ক'রে নেব, সাহেব। আপনি ওর এ্যাপয়েন্ট্‌মেণ্ট্ লেটারটা আমায় দিয়ে দিন।"

ব্র্যাড্‌লী কহিল, "বাবু, মিষ্টার হিগন্‌সের সঙ্গে পরামর্শ করে' কাল তোমায় চিঠি দেব। ভাবনা কোরো না, তোমার জামাই ছাড়া আর কাকেও এ কাজ দেওয়া হ'বে না।"

বড়বাবু ব্র্যাড্‌লীকে বুঝাইতে লাগিল, লোকের অভাবে তাহার অসুবিধা হইতেছে,—অনর্থক বিলম্বে প্রয়োজন কি? মিষ্টার ব্র্যাড্‌লীর কথার উপরে মিষ্টার হিগন্‌স্ কোনদিনই কিছু বলেন না, আর এই তুচ্ছ ব্যাপারেই কি বলিবেন?—মিষ্টার হিগ্‌নস্ আজ আফিসে থাকিলে বড়বাবু নিজেই তাঁহাকে বলিতেন, এবং যখন সাক্ষাৎ হইবে তখন তাঁহাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিবার দায়িত্বও তিনি লইতেছেন।—

ব্র্যাড্‌লী হাসিতে লাগিল, একটা এ্যাপয়েন্ট্‌মেণ্ট্ লেটার লিখিয়া দিল;—বড়বাবু সেটা পকেটে পুরিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ইহাই নিয়ম

অরিন্দম রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া চলে। বড় বড় বাড়ীগুলা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, হাজার হাজার লোক ওইখানে কাজ করে,—উহাদের মধ্যে যে-কোনো একজন হইতে পারিলে সে আজ খুসী হয়। পৃথিবীর ইতিহাস বানানোতে নহে, বিশ্বজয়ের অভিযানে নহে, একখানা ছারপোকাসঙ্কুল কেদারায় বসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটা টেব্‌লের উপর খানকতক কাগজ রাখিয়া কয়েকটা অপরে-বলা কথা নকল করিয়া যাওয়া, একটা লাল ফিতা দিয়া সেগুলাকে বাঁধিয়া রাখা,—ইহাতেই সে তাহার জীবনের সর্ব্বোত্তম সুখের স্বাদ লাভ করিতে পারে; ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় এত অল্প পাইলেই! কিন্তু অরিন্দম উহাদের একজনও নহে,—চাপরাসী বেয়ারাটি পর্য্যন্ত না। ক্রিং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া কেহ তাহাকে ডাকিলে সে হয়ত খুসী হইয়া উঠিবে,—কিন্তু সেটুকুও কেহ করে না।

অরিন্দম ভাবিতে লাগিল।

সমস্ত নীল আকাশটার মাঝে মাঝে সাদা মেঘের টুক্‌রাগুলা, কোথাও বড়, কোথাও ছোট,—তাহারই মধ্য হইতে সূর্য্যের আলোটা ঠিক্‌রাইয়া আসিতেছে,—চেয়ারে-বসা লোকগুলার উপরে নহে,—অরিন্দমের গায়ে। অযাচিত করুণা, অনাবশ্যক উগ্রতা, প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয়! মনে হইল, একবার ডাক দিয়া বলে, "তেজ একটু কমাও, বেশী দিন বাঁচিবে—"

সম্মুখে একটা স্কোয়্যার, তাহারই মাঝখানে একটা দীঘি। স্কোয়্যারের ভিতরকার গাছগুলার তলায় ছায়া পড়িয়াছে। অরিন্দম সেইখানে গিয়া বসিল। দীঘির জলটা পরিষ্কার, চাহিয়া থাকিলে বোধ হয় তলা পর্য্যন্ত দেখা যায়।—অরিন্দম নিজের জামাটার দিকে চাহিল, চতুর্দ্দিকের পরিচ্ছন্ন সুশ্রীতার মাঝখানে নিজের জামার মলিনতা এবং দুর্গন্ধ তাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল। সেটাকে খুলিয়া ফেলিয়া জড়াইয়া গোল রয়া রাখিল, তাহার পর তাহার উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

—কিছুদূরের গির্জ্জার ঘড়িতে দুইটার ঘণ্টা শোনা যায়। মোটরের হর্ণের চীৎকার, ট্র্যামের শব্দ হঠাৎ এক সময় বাড়ে, এক সময় কমে। ব্যাঙ্কের ভিতরে টাকাগুলা ঝন্-ঝন্ করিতেছে,—কাহাকেও ছুড়িয়া মারিলে মাথা ফুটা হইয়া যাইবে। সেইগুলা লইয়া ছিনিমিনি খেলা চলিতেছে ওই বাড়ীটার ভিতর। অরিন্দম মনে মনে হিসাব করে, কত টাকা আছে এই চারিপাশের ব্যাঙ্কগুলিতে, কত খরচ হইয়াছে এই পাঁচতলা, ওই ছয়তলা, ওখানকার শেষের সাততলা বাড়ীটা বানাইতে, কত টাকার সম্পত্তি আছে এই জায়গাটুকুর মধ্যে। সূক্ষ্ম হিসাব, গাণিতিক ব্যায়াম,—বিশ্ববিদ্যালয়ে চিরকালটা অঙ্কশাস্ত্রে পুরা নম্বর পাইয়া আসিয়াছে!

—অরিন্দম একবার উঠিয়া বসিল, জামাটার পকেট হাতড়াইয়া বাহির হইল কতকগুলা প্রশংসাপত্র,—মূল্যবান জিনিষ! শেষে

বাহির হইল একটা আধ্‌লা। অরিন্দম সেটাকে পুনরায় পকেটে পুরিয়া রাখিল, টেস্‌টিমোনিয়্যালগুলা যত্ন করিয়া ভাঁজ করিল, তাহার পর আবার শুইয়া পড়িল।

—গির্জ্জার ঘড়িটায় কোয়ার্টার বাজে, আধঘণ্টা বাজে,—দেহ মন ক্লান্তিতে ভরিয়া আসে,—চোখের পাতা দুইটা আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া আসিতে চায়।

দুপুর বেলা অরিন্দমের ভাগিনেয়ী মায়া বলিতেছিল, "মামিমা, আজ্‌কে মামা নিশ্চয়ই একটা কিছু ঠিক করে' আস্‌বেন, নয়?"

কল্যাণী অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, "হ্যাঁ, তাইত বল্‌লেন।"

বৃষ্টি নামিয়াছিল। গির্জ্জার ঘড়িতে পাঁচটা বাজিয়া গেছে। অরিন্দম জামাটা গায়ে দিয়া একটা আফিসের সিঁড়ির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল। কেরাণীগুলা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে,—রাস্তার ধারে লাইনবন্দী মোটর গাড়ী। এক একজন বড় কর্ম্মচারী, বড় সাহেব জুতা মস্‌মস্‌ করিয়া আসেন, সন্ত্রস্ত কেরাণীকুল রাস্তা ছাড়িয়া দেয়, চাপরাসী মাথায় ছাতা ধরে, গাড়ীর দরজা খুলিয়া দেয়, মোড়ের মাথায় পুলিশটা তাহার বাঁশীতে ফুঁ দেয়, গাড়ী ছাড়ে।

অরিন্দমের চোখের সাম্‌নে সমস্তটা যেন বায়স্কোপের ছবির মতন ভাসিতে থাকে। মনে করে, আফিসের সিঁড়ির উপরে দাঁড়াইয়াছি,—পরিচিত লোকে দেখিলে বুঝিবে যে, চাকরী করিয়া বাহির হইতেছি!—যাহাদের সময়ের মূল্য আছে, মাসকাবারী মাহিনার ভরসা আছে, তাহাদের সঙ্গে গা ঘেঁসা-ঘেঁসি করিয়া আছি,—কেহ চলিয়া যাইতে বলিতেছে না, দাঁড়াইয়া থাকিতে বারণ করিতেছে না,—"চাকরীর বাজার বড় আক্রা,"—এ উপদেশ কেহ দেয় না,—শুভ লক্ষণ!

দুইজন কেরাণী আলাপ করিতেছিল। শীর্ণ, মলিন তাহাদের চেহারা, ছেঁড়া জামা, বগলে তালি-দেওয়া ছাতা।

প্রথম জন কহিল, "যত বৃষ্টি কি বাবা, বাড়ী ফের্‌বার বেলা!—আফিসে আস্‌বার সময় কি একবার জোর করে' নাম্‌তে পার না,—সেই ছুতোয় আধঘণ্টা ঘুমিয়ে বাঁচি যে তাহ'লে।"

অন্যজন বলিল, "অমন প্রার্থনা ঠাট্টার ছলেও কোরোনা হে,—কেউ শুন্‌লে হয়ত ঘুমোবার জন্যে অনন্ত অবসরই মিলে যাবে।"

প্রথম লোকটা ছাতাটি শক্ত করিয়া বগলে চাপিয়া ধরিল, পথ-চল্‌তি অসংখ্য গাড়ীগুলার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আমার গাড়ীটা হুস্‌ করে' আসে,—চট্‌ করে' ছাতাটা নিয়ে উঠে পড়ি,—চোখ বুজে বাড়ী গিয়ে হাজির হই,—বৃষ্টি ত বৃষ্টি,—ছোঃ!"

দ্বিতীয় লোকটি হাসিল, নীরসকণ্ঠে কহিল, "গাড়ী!—

এখানেও কড়িকাঠ, বাড়ীতেও কড়িকাঠ! গাড়ী থাক্‌লে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম বঙ্গের বন্যা, পদ্মার ভাঙন্, এ্যাট্‌ল্যান্টিক্ ওপানের ঢেউ এই সবই গ্রাহ্য কর্‌তাম না, ত বৃষ্টি!"

অরিন্দম চাহিয়া রহিল। ইহারা গাড়ী চাহিতেছে! ইহারা খাইতে পায়, পেট ভরিয়া নহে—কিন্তু তবু পায়, অরিন্দম আজকাল তাহাও পায় না, কিন্তু যদি পাইত তাহা হইলে হয়ত একখানা গাড়ী চাহিত। হুস্ করিয়া আসে, চট্ করিয়া সে উঠিয়া পড়ে ছেঁড়া ছাতাটা বগলে করিয়া,—কিন্তু বগলে করিবার মতন একটা ছেঁড়া ছাতাও নাই!

অরিন্দম হাসিতে লাগিল। পাশের দুই একটা লোককে বিস্মিত চোখে তাহার পানে চাহিতে দেখিয়া সে আর সেখানে দাঁড়াইল না।

তখন বৃষ্টি থামিয়া গেছে,—তাহার রাস্তা-চলা আবার আরম্ভ হইল।

সমস্তদিন কিছু খাওয়া হয় নাই।—পকেটে হাত পুরিয়া দিয়া, আধ্‌লাটাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া সে নিজের মনে বলিল, "গ্র্যাণ্ড হোটেল, ব্রিস্টল্ হোটেল, কাফে সেন্‌ট্র্যাল, গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল,—কোথায় যাই? নিউমার্কেটে যাব? —কি কি কিন্‌ব এই আধ্‌লাটা দিয়ে? খাবার? লাট সাহেবের বাড়ী?

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল? ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম?" সে আবার হাসিতে লাগিল।

একটা উড়িয়ার দোকানের সম্মুখে আসিয়া অরিন্দম দাঁড়াইল, আধ-পয়সার মুড়ি কিনিয়া গোগ্রাসে খাইতে আরম্ভ করিল। মুড়িতে যে এত রস থাকিতে পারে, সে গোপন খবর ধন-কুবেররা এখন পর্য্যন্ত টের পান নাই।

অরিন্দম যখন ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া মুড়ি খাইতে ব্যস্ত, তখন একটা পাগল রাস্তার মাঝখান দিয়া চলিয়া যায়, দুইটা হাত খুব জোরে জোরে নাড়িয়া বলিতে বলিতে যায়, "কল্‌কাতাতেও টাকা দিয়ে ভাত, রাওলপিণ্ডিতেও টাকা দিয়ে ভাত, তবে কিসের—"

মুড়ি খাওয়া ভুলিয়া অরিন্দম একদৃষ্টে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। লোকটা দ্রুতপদে চলিতেছিল, শীঘ্রই দূরে মিলাইয়া গেল,—ময়লা খদ্দরের কোট গায়ে, সম্মুখে-ঝুঁকিয়া-পড়া দেহ।

—রাস্তার ধারে ধারে প্রাসাদোপম বাড়ী, তাহাদের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করিবার জন্য সম্মুখে ছোট বড় বাগান, কৃত্রিম প্রস্রবণ, মর্ম্মর মূর্ত্তি, প্রকাণ্ড লোহার সিংহদ্বার, তাহারই সম্মুখে বন্দুক ঘাড়ে করিয়া সিপাহী সান্ত্রীর দল পাহারায় নিযুক্ত থাকে।

ঘরে ঘরে শ্বেত পাথরের মেঝে, সুচিত্রিত দেওয়াল, বিচিত্র-

বর্ণের ছাদ, মোজেকের সিঁড়ি, বহুমূল্যবান ছবি,—একটার দামে হয়ত একশতটা লোক ছয়মাসের জন্য প্রতিপালিত হইতে পারে! আস্‌বাবগুলা পালিশের ঔজ্জ্বল্যে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। বিদ্যুতের আলোকগুলি অদ্ভুত, তাহাদের আধারগুলি অদ্ভুত,—চতুর্দ্দিকে তাকাইলে চমক লাগে—বিলাসের আশ্চর্য্য সম্ভার!

—বাহিরে বাহিরে ক্রন্দন, একটু দাঁড়াইবার স্থানের জন্য মারামারি, দুই মুঠা অন্নের জন্য হাহাকার। দিনান্তে কতজনের ভাবনা ভাবিতে হয়। মনে হয়, পয়সা দিয়া ভাত এখানেও, রাওলপিণ্ডিতেও, তবে কিসের—?

বাকী ধারণাটা পরিষ্কার নহে, আধ্‌লার জন্য কাকুতি যেখানে, সেখানে পয়সার ধারণা পরিষ্কার হয় না।

গরম দেশ,—বস্ত্রের বাহুল্য কমিয়া আসিতেছে, অন্নের ভাবনা কমিয়া আসিতেছে, মোক্ষলাভের পথ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে।

ওই বাড়ীগুলা, ওই গাড়ীগুলা, ওই সিপাহী সান্ত্রীগুলার পানে চাহিয়া অরিন্দমের চোখ দুইটা বোধ হয় অকারণেই জ্বলিতে লাগিল।

অনাবশ্যকভাবে হাঁটিয়া হাঁটিয়া অরিন্দম রাত্রি নয়টার সময় বাড়ী ফিরিল।

বাড়ীতে লোকের সংখ্যা কম নহে; ছোট ছোট ছেলে

মেয়েও কয়েকটি আছে। তাহাদের ভিতরে কোনটাই ঠিকমত খাইতে পায় না। শুধু গলার কাছে প্রাণটুকু ধুক্‌ধুক্ করে বলিয়াই যেন তাহারা জগৎ-সংসারকে কৃতার্থ করিয়াছে, এম্‌নি তাহাদের প্রত্যেকটির চেহারা।

কিন্তু কল্যাণীর শিক্ষায় বাড়ীর সবগুলি ছেলেমেয়েই এতদূর সংযত হইয়া উঠিয়াছে যে, সংসারের ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম শিশুটি পর্য্যন্ত কোন অভাব অভিযোগের কথা অরিন্দমের কানে তোলে না; এবং এমন কি সে যতক্ষণ গৃহে থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত যথা-সম্ভব চুপ করিয়া হাসিমুখে খেলা করিতে চেষ্টা করে। অরিন্দম বিস্মিত হয়,—মনে মনে যে ব্যথা অনুভব করে, তাহার কোন ভাষ নাই।

অরিন্দম গৃহে ফিরিতেই মায়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। মাতুলের মুখের দিকে চাহিয়া কোন প্রশ্ন না জিজ্ঞাসা করিয়াই কহিল, "মিছরীর সরবৎ করে' রেখেছিলাম মামা, তুমি বিকেল-বেলা ফির্‌বে বলে'।—কাপড়-চোপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে এস, এনে দিই।"

মায়া বাহির হইয়া গেল। তাহার গমন-পথের দিকে চোখ রাখিয়া অরিন্দমের এতক্ষণের শুষ্ক আঁখি দুইটা জলে ভরিয়া উঠিল। তাহার বড়দি' এষার একমাত্র কন্যা। বিবাহের তিন বৎসর পরে শিশু মায়াকে কোলে লইয়া তিনি বিধবার বেশে পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসেন। তাহার পর আর একবারও শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।—

শৈশব হইতেই মায়া তাহার ছোটমামার স্নেহের একটা বড় অংশ জুড়িয়া আছে। অরিন্দমের মতলব ছিল, সে খুব লেখা-পড়া শিখিবে, অন্তরের মাধুর্য্যে স্বভাবের উৎকর্ষে সকলের স্নেহ আকর্ষণ করিবে। নিজের মতে সে তাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছিল। পয়সার অভাবে স্কুলে পাঠাইতে পারে নাই, নিজেই অবসর মত ঘরে পড়াইয়াছে। তাহার জন্য মনে মনে বরও ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল—খুব কম করিয়া একজন সত্যকার বিদ্বান অধ্যাপক, না হয় স-মক্কেল ব্যারিষ্টার। ইহার পানে চাহিয়া তাই চোখে জল আসে। আজ হয়ত খানিকটা সাগু খাইয়া কাটাইয়াছে, কিংবা তাহাকে যেটুকু দেওয়া হইয়াছিল সেটুকুও কল্যাণীকে গোপন করিয়া ছোটদের দলের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছে! কিন্তু—

মায়া ফিরিয়া আসিল। হাতের একটা বাটীতে ছুইটা খইয়ের মোয়া, এবং গেলাসে মিছরীর সরবৎ। জিনিষ ছুইটা মেঝেতে রাখিয়া, অরিন্দমকে একভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া গালে হাত দিয়া মায়া বলিল, "ওমা জামাটা পর্য্যন্ত এখনও ছাড়নি! কি ছেলে বাপু তুমি! ওঠ, ওঠ, যাও শীগগির করে' হাত মুখ ধুয়ে এস।" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে টানিয়া তুলিল।

অরিন্দম জিজ্ঞাসা করিল, "মায়া, দিদি বৌদি কোথায় রে?—তোর ছোট মামীমাই বা কোথায় গেল?"

"সব ওঘরে—" বলিয়া মায়া খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিল।

অরিন্দম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল,—চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, সমস্ত মুখখানা অসম্ভব রকমের রক্তলেশশূন্য। অরিন্দম ভাবে, সেই মায়া এখন কি হইয়া গেছে! কিন্তু তবু মুখের হাসিটুকু ঠিক সেই রকমই আছে!—আশ্চর্য্য!

'ওঘর' কথাটার মানে অতীতের রন্ধন এবং বর্ত্তমানের শয়ন গৃহ। দর্মার বেড়া, খোলার ছাদ,—আগে সেইখানেই রান্না হইত, কিন্তু আজ মাস দুই হইল ও-বালাই আর নাই, বড়-জোর গাছতলা হইতে কুড়াইয়া আনা গোটাকতক পাতা সিদ্ধ, নয়ত বার্লির রাজভোগ, অথবা মুড়ি,—তজ্জন্য সেটাকেও আজকাল শয়নঘরস্বরূপ ব্যবহার করা হইতেছে।

অরিন্দমের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মায়া দাঁড়াইয়া রহিল, শেষে বাহির হইয়া গেল।

ঘরের মধ্যে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলিতেছিল,—একটা লম্বা দড়িতে বাড়ীশুদ্ধ সমস্ত লোকের কাপড় জামা টাঙান। একশ'টা ফুটা, একশ'টা শেলাই হয়ত প্রত্যেকটার ভিতর হইতে বাহির হইবে; ছয় মাসের মধ্যে, ধোপাবাড়ী ত দূরের কথা, সাবানের মুখও দেখিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তবু সেগুলার পানে চাহিলে তাহাদিগকে দুর্গন্ধবিহীন করিবার একটা বিপুল প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘরের মেঝেতে গুটি তিনচার ছিন্ন মাদুর, এক কোণে একটা পিঁড়ির উপরে খানকয়েক বই এবং খাতা গুছান, আর কোথাও কিছু নাই।

মায়া একখানা ছেঁড়া ইংরেজী বই হাতে ফিরিয়া আসিল। মাতুলকে প্রদীপের নিকট টানিয়া লইয়া গিয়া বইয়ের একখানা পাতা খুলিয়া কহিল, "দেখ তোমার ভাগ্নের কীর্ত্তি!"

ইতিহাসের বই, মাঝে মাঝে ছবিও আছে,—প্রত্যেক ছবির নীচে অরিন্দমের সেজদি উষার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান পৃথ্বীশ ওরফে বুলু'র একটি করিয়া টিপ্পনী লেখা আছে।

বুলুর জীবনের উপর দিয়া মাত্র আটটি বর্ষা কাটিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া রসগ্রহণের ক্ষমতা যে তাহার কিছুমাত্র কম, একথা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

একজন নাবিকের ছবির তলায় লিখিয়াছে, "তোমার টুপি নাই?"—একজন সৈনিকের মর্ম্মরমূর্ত্তির তলায় লেখা, "তোমার বন্দুক কই?"—মাঠের মাঝে একটা তাঁবুর ছবি; কিছুদূরে কয়েকটা সৈনিক মিলিয়া কি যেন একটা রান্না করিতেছে, অল্পদূরে একজন লোক একা বসিয়া।—তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, সে যে কোন পদস্থ ব্যক্তি, এ ধারণা বুলুর মনেও হইয়াছে,—তাহার নীচে সে লিখিয়াছে, "সেনাপতি, ভাত খাইবে বলিয়া তোমার জিভ দিয়া জল পড়িতেছে?"—

অরিন্দম বাহিরের বারাণ্ডাটুকুর নিবিড় অন্ধকারের পানে তাকাইয়া রহিল,—মনে মনে হিসাব করিতে লাগিল, বুলু আজ ভাত খায় না কতদিন?—

পাতাটা উল্টাইয়া মায়া হাসিতে লাগিল, কহিল, "মামা, দেখ!"—রাজার ছবি,—সিংহাসনে উপবিষ্ট, হাতে

রাজদণ্ড, মাথায় মুকুট,—বুলু তাহার তলায় অভিমত প্রকাশ করিয়াছে, "রাজার পোষাক আর কিছুদিন পরে আমাকে দিয়া দিবে।"

—অরিন্দমের চোখের পাতা দুইটা আবার ভিজিয়া উঠিল।

অনেকগুলি লোক,—স্ত্রী, দুটি বড় বোন, বিধবা বৌদিদি, মায়া এবং আরও অনেকগুলা কাচ্চাবাচ্চা। অরিন্দমের বিবাহের মাস চারেক পরেই জননী মারা গিয়াছিলেন।—বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলেন, অনাবশ্যক বোঝা, অবিবেচক কুপোষ্যের দল,—অবশ্য তাঁহারা স্ত্রীকে বাদ দিয়াই বলেন।

অরিন্দম মনে মনে হাসে, পোষ্য! কে কার পোষ্য কে জানে! রুমাল সেলাইয়ের পয়সায়, নানারকম জামা এবং অন্যান্য সেলাই প্রভৃতির মূল্যে কল্যাণী, মায়া এবং তাহার বৌদি, দিদিরা যে কেমন করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে সে খবর তাহাদের শত যত্ন সত্ত্বেও অরিন্দমের অজ্ঞাত ছিল না, এবং বোধ করি সেইজন্যই দুঃখেরও তাহার সীমা ছিল না।

ইহারা যদি নিত্য নিয়ত অভাব অভিযোগের কথা শুনাইতে বসিত, তাহা হইলে সে সকল কথা একান্ত সত্য হওয়া সত্ত্বেও হয়ত অরিন্দমের মনে বিরক্তির কারণ ঘটাইত। কিন্তু যে-অভাবের কথা "নিজেদের বুকের রক্ত দিয়া তাহারা তাহার

চোখের আড়ালে রাখিতে চাহিত, তাহাই যখন তাহাদের অনিচ্ছাতে এবং অজ্ঞাতসারে তাহার চোখে পড়িত তখন তাহার বেদনার অবধি থাকিত না। তাই অরিন্দম সর্ব্বদা ইহাদের কথা মনে করিয়া শ্রদ্ধাবনতচিত্তে নীরব হইয়া থাকে।

—বাহিরের মানুষের হৃদয়ের দুয়ার আজ বন্ধ।—সহস্র প্রকারের ফন্দী-ফিকির, অসংখ্য রকমের চালবাজীতে আজ মানুষের মস্তিষ্ক ভরিয়া আছে। আদবকায়দা এবং বাহিরের জাঁকজমক অতিক্রম করিয়া কাহারও কাছে গিয়া পৌছানই এক বিরাট ব্যাপার,—কিন্তু তাহার পরেও তাহার সাড়া মেলে না। বহু মিনতির শেষে যদি বা ঘরের দরজা পার হইয়া ঘরে ঢোকা যায়, তাহা হইলেও অন্তঃকরণের নিকটে গিয়া সভয়ে পিছাইয়া আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

অরিন্দম কোন দিকে চাহিয়া কোন পথই যেন আর খোলা দেখিতে পায় না।

আবার দিবা দ্বিপ্রহর,—বড় রাস্তার ফুটপাথ,—একটা কলের কাছে গিয়া অরিন্দম জল খাইবার চেষ্টা করিল,—কিন্তু একফোঁটা

জলও কলটার ভিতর হইতে বাহির হইল না। সূর্য্যের দিকে চাহিয়া মনে হইল, বেলা তিনটার বেশী ছাড়া কম হইবে না,—কিন্তু তবুও জলের দেখা নাই!—কর্ত্তব্যপরায়ণ মিউনিসিপ্যালিটি!

সম্মুখে একটা ঘড়ির দোকান,—অরিন্দম সেখানে একবার ঘড়ি দেখিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সেখানকার ঘড়িতে একটা হইতে আরম্ভ করিয়া বারোটা পর্য্যন্ত সমস্ত কিছুই বাজিতে-ছিল,—অতএব বেলা টের পাওয়া গেল না।

অরিন্দম জলের কলটার কাছে দাঁড়াইয়া, আর একবার সেটাকে খুলিবার চেষ্টা করিল,—কিন্তু ফল পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইল না।—কলটা বোধ হয় খারাপ, কিংবা হয়ত আসল পাইপের সহিত যোগ করা নাই,—কিছুই ঠিক করিয়া বলা যায় না। কর্ত্তব্যপরায়ণ মিউনিসিপ্যালিটি!—

তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। সে একবার ঢোঁক গিলিয়া গলাটা ভিজাইয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বিশেষ কোন উপকার হইল না।—অরিন্দম আবার চলিতে থাকে।—

রাস্তার উপরেই একটা প্রকাণ্ড বাড়ী,—সেইটার দিকে তাকাইয়া সে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিল। বাহিরের একটা ঘরের রাস্তার দিকের জানালাগুলা খোলা ছিল, তাহার মধ্য দিয়া ঘরের ভিতরের সমস্ত জিনিষই চোখে পড়ে। ঘরটা অতিরিক্ত আসবাবপত্রে পরিপূর্ণ,—মাঝখানে একটা গোল শ্বেত-পাথরের টেব্‌ল্, তাহার উপরে প্লেট, ডিস, গেলাস এবং কাঁটা চামচ ইত্যাদি ছড়ান অবস্থায় রহিয়াছে,—

সেখানে কিয়ৎপূর্ব্বে ভোজনের সুস্পষ্ট চিহ্নসকল বিদ্যমান। উপরে বৈদ্যুতিক পাখাটা পুরা জোরে ঘুরিতেছে,—ঘরে একটাও লোক নাই।

চাহিয়া চাহিয়া অরিন্দম মুগ্ধ হইয়া গেল! তাহার বারেবারেই মনে হইতে লাগিল, ইহাদের ষোড়শোপচার ভোজনে এতগুলা টাকা খরচ হইয়া গেছে, এখন অনাবশ্যকভাবে পাখাটা ঘুরিতেছে!—খুব সম্ভব ভ্রমক্রমে কেহ বন্ধ করিয়া যায় নাই!

ইহাদের ব্যয়বাহুল্য এবং বেহিসাবের বহর দেখিয়া অরিন্দম অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। সে ভাবিল, ফটক ত খোলাই রহিয়াছে, সোজাসুজি প্রবেশ করিয়া ওই-ঘরের পাখাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিলে কেমন হয়! তাহার মনে হইল, সেটাকে থামাইতে না পারিলে যেন সে বাঁচিবে না!—এত অমিতব্যয়িতা অসহ্য!

কিন্তু পাখাটা তখনও ঘুরিতেছে। সেইটার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অরিন্দমের যেন নেশা লাগে,—শত ইচ্ছা সত্ত্বেও সেখান হইতে সে নড়িতে পারে না,—শুধু ভাবে, অনর্থক টাকাগুলা নষ্ট করা,—মাসের শেষে একটা মোটা টাকার বিল নিশ্চয়ই হইবে!—

অন্তরে বাহিরে

বাহিরে—

সাইন্‌বোর্ড-ওয়ালাটাকে সাইনবোর্ডটা লিখিতে দেওয়ার সময় অনেক চিন্তা করিয়াছি। লোকটা অক্ষর-পিছু চার চারটা পয়সা করিয়া চার্জ্জ করিয়াছে। নিজের নামটা তাই অনেক ইতস্ততঃ করিয়া বাদ দিয়াছি। কম পয়সায় নাম লিখান যাইবে, এমন নামও পিতামাতা রাখেন নাই,—কুলকুণ্ডলিনীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,—ইহার উপরে বাংলায় স্বত্বাধিকারী না লিখিয়া, ইংরেজী কেতায় 'প্রোঃ' লিখিলে মোটমাট দাঁড়ায় ষোলোটা অক্ষর, তাহার সহিত যদি যোগ করি M. A., তবে হয় আঠারোটা, যদি করি এম্‌-এ, তবে হয় উনিশটা। সর্ব্বশেষে, যদি নিজেকে 'শ্রী'মণ্ডিত করি, তাহা হইলে গিয়া দাঁড়ায়

কুড়িটাতে। এই সকলই বাদ দিয়াছি, পাঁচসিকা আন্দাজ পয়সা বাঁচিয়াছে।

মোহনলাল সাহা লেন, আর পিণ্টু বসু ষ্ট্রীট, এই দুইটি আটহাত চওড়া গলির মোড়ে, যে-কোনও চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই 'দ্য গ্রেট্ ডিফারেন্‌শ্যাল অন্নপূর্ণা ষ্টোর্স'-এর সাইনবোর্ড দেখিতে পাইবেন। চাল, ডাল, তেল, ঘি হইতে আরম্ভ করিয়া কাগজ, কলম, দোয়াত, পেন্সিল, হেজ্‌লিন, পমেড, পাউরুটি, বিস্কিট, লেমনেড, বিড়ি, সিগারেট—সকলই পাওয়া যায়। যদি কিছু না মেলে, তবে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দিলে যত্নের সহিত মাল সরবরাহ করিয়া থাকি, ভেজাল দিই না একটুও।—পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

—খোলার ঘর, মাসে ছয় টাকা করিয়া ভাড়া। সামনে খোলা নর্দ্দমা। কাদার উপর দিয়া ভাতের ফ্যান, আঁস্তাকুড়ের আবর্জনা গড়াইয়া চলে। একখানা পুরু তক্তা নর্দ্দমার এধার হইতে ওধার অবধি ফেলা আছে। কিছু দূরে একটা জলের কল, সকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত সেখানে অবিশ্রান্ত ভিড়, কোলাহল এবং গালাগালির বিরাম নাই। চারিদিকে খোলার বস্তি।

সকালবেলা, সবেমাত্র ঘুম হইতে উঠিয়া, 'অন্নপূর্ণা ষ্টোর্স'-এর ঝাঁপ খুলিয়া গঙ্গাজলের ছিটা দিয়াছি, এমন সময় সহদেব

আসিয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে হাসিমুখে কহিল, 'প্রাতো-পেন্নাম দা'ঠাকুর, শরীল গতিক ভালো ত ?'

উপরের-তাকে-রাখা একটা লাল-সাদা রং করা গণেশ মূর্ত্তিকে নমস্কার করিতে করিতে জানিলাম যে, আজ যদি না সহদেবকে ধারে পাঁচ সের চাল দিই, তাহা হইলে সে ওই নর্দ্দমার উপর পড়িয়া গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা হইবে, এবং সে সকলের দরুণ যাহা কিছু পাপ সকলই নাকি আমাকে স্পর্শ করিবে !

—সহদেব ছিল কণ্ডাক্টার, মাসে উনিশ টাকা মাহিনা পাইত, চোখ দুইটা দেখিলে ভয় হইত, যেন ভিতরকার সমস্ত বন্ধন ছাড়াইয়া তাহারা বাহির হইয়া আসিবে। সাম্‌নের গুটিতিনেক দাঁত নীচের পুরু ঠোঁটটা ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। গাঢ় হলুদ সেইগুলার রং, সমস্তটা মিলিয়া মনে হইত, যেন একটা হিংস্র রক্তলোলুপ জীব, যে-কোন মুহূর্ত্তেই ঘাড় মটকাইতে পারে।

সহদেব হাসিতে লাগিল, বলিল, "মাইরি দা'ঠাকুর, শালার আপিসে গেল মাসে পাঁচ পাঁচটা টাকা ফাইন করে' দিলে,— তাইতেই ত ধার চাইছি, নইলে,—আচ্ছা, তুমিই বল না, পিসে, সহদেব কি কোনদিন কারও ঠেঁয়ে এক পয়সা ধার করেছে, না, কারও একমুঠো খেয়েছে ! হাজার হোক একটা পিরিন্‌সিপুল আছে ত।"

—সহদেব বলিত, সে কায়েতের ছেলে, কুলীন কায়স্থের সন্তান সে,—থার্ড ক্লাস অবধি পড়িয়াছে।

বস্তির সরকারী পিসে কালীচরণ ঘরামি এবং মহাশয় ব্যক্তি। সমস্ত শাস্ত্র সে জানে, ব্যাখ্যা করিতে পারে। রামায়ণ এবং মহাভারত ত তাহার জিহ্বাগ্রে! একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আচ্ছা দা'ঠাকুর, তুমি ত লেকাপড়া জান, সীতাদেবীর অগ্নিপরীক্ষের পর রামায়ণে কি হ'ল বল দিনি।"

আমি জবাব দিতে পারি নাই, সেই হইতে আমার বিদ্যাবুদ্ধির সত্যতা সম্বন্ধে কালীচরণের একটা সন্দেহ জন্মিয়া গেছে।

কালীচরণ কহিল, "তা সেকথা সত্যি দা'ঠাকুর, সদার আমাদের সে গুণটো আছে। দিয়ে দাও, দা'ঠাকুর, পাঁচ সের চাল, ছোঁড়া বেঁচে থাক্‌লে তোমার পয়সা মারা যাবে না।"

সহদেবের কাছে, আমার হিসাবমত, আঠারো টাকা সাড়ে-পাঁচ আনা পাওনা হইয়াছিল। খুচরা পয়সা কয়টা ছাড়িয়া দিয়া, তাহার নামে আঠারো টাকার জন্য নালিশ করিব স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। কহিলাম, "শালার আপিসে ত প্রত্যেক মাসেই তোমার পাঁচ পাঁচটা টাকা ফাইন্ করে সহদেব,—তুমি তাহ'লে নগদ দাম দিয়ে চাল কিন্‌বে কবে?—পাঁচ সের চাল তোমায় এখন ধারে দিতে পার্‌ব না, বড়-জোর আধ-সের পর্য্যন্ত পারি, যদি রাজী হও ত নিয়ে যাও। তবে পয়সাটা একটু শীগগির দিয়ো।"

সহদেবের বহির্গমনোদ্যত চোখ দুইটা আর কোটরের ভিতর থাকিতে চাহিল না। স্বাভাবিক তিনটার স্থানে দুইপাটির

বত্রিশটা হলুদ রং-এর দাঁতই কালো মোটা ঠোঁট দুইটা অতিক্রম করিয়া যেন আমাকে আক্রমণ করিতে আসিল। সে কহিল, "ওঃ, কি মস্ত বড় বাবু রে! একটা ভদ্দোর সন্তানকে পাঁচ সের চাল দিয়ে বিশ্বেস করতে পারেন না, উনি আবার অন্নপূন্নো!—আচ্ছা দাও দাও, আধ-সেরই দাও, আমিও দেখে নেব তোমার দোকান এখানে কদ্দিন থাকে,—হ্যাঁ বাবা, সহদেব সে ছেলেই নয়—"

সহদেব আমায় প্রায়ই ভয় দেখাইত, সে দেখিয়া লইবে আমি কেমন করিয়া এ পাড়ায় থাকি! তাহার এবং আরও অনেকের আস্ফালন-সত্ত্বেও এখানে টিঁকিয়া আছি আজ পাঁচ বছর।

চাল ওজন করিয়া দিয়া বলিলাম, "আধ-সের চালের দাম আট পয়সা, সহদেব। দশ টাকা হিসেবে মণ দিতে হবে, দাম বেড়ে গিয়েছে।"

"আচ্ছা, দাও দাও,—এ মাসের মাইনে পেলে কোন্ শালা আর তোমার পয়সা ফেলে রাখে!" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

এই চালই সে অন্যত্র ছয় টাকায় পাইতে পারিত। আমি ধরিলাম চার টাকা বেশী। এক টাকা তাহার রক্তচক্ষুর খেসারত, এক টাকা তাহার ধারের সুদ, দুই টাকা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মূল্য। এই রেটেই সকলের কাছ হইতে লইয়া থাকি; যদিও অপরের বেলায় রক্তচক্ষুটা বাদ যায়। এম্-এ পাশের খরচ উঠিয়া গেলে সকল জিনিষের দর সুবিধা করিয়া দিব, নগদ পয়সায় লইলে আরও কিছু সস্তায় পাইবে।

বেলা বাড়িতে লাগিল। রাজমিস্ত্রী, ছুতোরমিস্ত্রী, গাড়োয়ান, মোটরগাড়ীর ড্রাইভার, ঘরামি, ডকের কুলী, মজুর, মেছুনী, ঝি, ভিখারী প্রত্যেকেই আপন আপন কাজে বাহির হইয়া গেল। কিছু দূরের ডাক্তারবাড়ীর অহীনবাবুর ছেলে কুমার আসিয়া বলিল, "প্রসাদবাবু, বাবা বল্‌লেন যে, আমাদের একটা চাকর কাল পালিয়ে গিয়েছে কিনা, একটা ঠিকে ঝি যদি আপনি জোগাড় করে' দিতে পারেন, তাহ'লে খুব ভালো হয়।"

জবাব দিলাম, "আচ্ছা—"

—এলোকেশীকে ঝি'র সর্দ্দারণী বলিয়াই জানি। সকালবেলা কলতলায় স্নান করিতে আসিয়া একবার দোকানের ঝাঁপটার কাছে দাঁড়ায়, চট্ করিয়া নারিকেল তেলের কলসীর ভিতর হইতে পলাটা আচম্‌কা তুলিয়া লইয়া, বাঁ হাতের চেটোয় তেল ঢালিয়া লয়। মাথার মাঝখানটায় একটা প্রকাণ্ড টাক পড়িয়া গেছে, ঠিক সেইখানে সমস্তটা তেল ঢালিয়া দিয়া, মাথাটা অদ্ভুতভাবে চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলে, "শরীলটা বড়ই কাহিল হ'য়ে পড়েছে, দা' ঠাকুর।"

আড়চোখে তাকিয়ে তেল লওয়ার বহর দেখি, চালের দাম ধরি, ছয় টাকার জায়গায় এগারো টাকা, সরিষার তেলের দাম ধরি সাড়ে-ন' আনার জায়গায় বারো আনা। দুই পয়সা দামের লাল, নীল, গোলাপী, সবুজ গায়ে-মাখিবার সাবানের দাম ধরি চার পয়সা করিয়া!—এই প্রকারেই বাঁচিয়া আছি।

সন্ধ্যাবেলায় 'অন্নপূর্ণা ষ্টোর্স'-এর পিছনের খোলার ঘরে কালীচরণের শাস্ত্রচর্চ্চার বৈঠক বসে, সঙ্গে সঙ্গে চলে সঙ্গীত। এলোকেশীকে সেখানে বসিয়া অত্যন্ত গম্ভীর মুখে মনু, পরাশরের শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে শুনি প্রায় প্রত্যহ। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, "এলোকেশী, আমাকে একটি ঠিকে ঝি জোগাড় করে' দিতে পারবে, বাছা? অহীনবাবুদের দরকার, আমাকে বলেছেন।"

কথা শুনিয়া এলোকেশী চোখে কাপড় দিল, ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "যেমন খয়রাত করে' এইচি, দা-ঠাকুর, তোমাদের এই তুরুশ্চু কথাটিও যে রাখ্‌ব, ভগবান কি সেই সুখটুকুনই আমার কপালে নিকেচেন? হারামজাদীরা কি আজকাল আর বাসন মাজ্‌তে চায় গো, দা'ঠাকুর। বল্‌লে, বলে কি জান? 'কালীঘাটে মা'র মন্দির আছে, সকালে বিকেলে তারই দোরগোড়ায় যদি বসি, চোখ বুজে যদি বলি, দোহাই গো বাবু, দোহাই গো মা, এই গরীব, অন্ধ, অনাথাকে একটি পয়সা দিয়ে যাও গো দয়া করে', এক গুণ দিলে সহস্র গুণ হ'বে ধনেপুত্রে লক্ষীলাভ হবে,—তাহ'লে দু' বেলায় কিছু না হ'লেও

একটা টাকা ভিক্ষে মেলে,—গতর থাটাতে [illegible] কোন্ দুঃখে।
বলিতে বলিতে এলোকেশী কাঁদিয়া ফেলিল আর কি!

অনেক কষ্টে তাহাকে থামাইয়া বলিলাম, "তারা যদি না কাজ করে, তবে তুমি আর কি করবে বাছা! তোমার আর দোষ কি? তুমি নিজের কাজে যাও এলোকেশী, আমি অহীনবাবুদের বলব'খন যে, ঝি পাওয়া গেল না।"

কিন্তু, আমার এই "তুরুশ্চ" কথাটা পর্য্যন্ত না রাখিতে পারিয়া, সে আবার চোখে আঁচল দিয়া, অতীতকালের সমস্ত ঝি এবং বর্ত্তমানকালের ভিখারিণীদের উদ্দেশে অযথা বহু কটুকাটব্য করিয়া অতিশয় ধীর পাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিল।

—যথেষ্ট চেষ্টা করিলাম কয়েক দিন ধরিয়া, কিন্তু বেশ মোটা মাহিনা কবুল করিয়াও একটা ঝি জুটাইতে পারিলাম না।

দোকানের সম্মুখের নর্দ্দমাটার বিষাক্ত দূষিত বাতাস সমস্ত পল্লীটাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। নিশ্বাস টানিতে ভয় হয়, মনে হয় যেন কখন কি অঘটন ঘটিয়া বসিবে! ইহারই মধ্যে দুইটা পয়সা সঞ্চয় করিবার আশায় চোখ কান বুজিয়া অগ্রসর হইয়াছি।

সন্ধ্যাবেলা, ধুনা দেওয়া হইয়া গেছে। একটা কেরোসিনের আলো মাচার সহিত ঝুলাইয়া দিয়াছি। তাহারই নীচে একটা

পাঁচসিকা দামের চৌকির উপরে বসিয়া স্পেন্সারের "ফেয়ারি কুইন" খুলিয়া বসিয়া মনে মনে হাসিতেছি।

সহদেব আসিয়া ঘরে ঢুকিল। গায়ে তাহার ছেঁড়া জামা, চোখ দুইটা আরও ভয়ানক বলিয়া বোধ হইতেছিল, ঠোঁটের কোণ দুইটা দিয়া পানের কস্ গড়াইয়া পড়িতেছিল, হল্‌দে রং-এর দাঁতগুলাতে লালের ছোপ লাগিয়া একটা অসহ্য কদর্য্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল,—সমস্ত মুখখানার দিকে যেন তাকাইতে পারা গেল না। মাথার চুলগুলা উস্কখুস্ক, জুতাটার পিছনের চামড়া হিল হইতে একেবারে আল্‌গা হইয়া গিয়াছিল, পা'টাকে ছেঁচ্‌ড়াইয়া ছেঁচ্‌ড়াইয়া সেটাকে বহন করিতে হয়।

সহদেব আমার অত্যন্ত কাছ ঘেঁসিয়া আসিয়া বসিল। ভারি আত্মীয়ের মতন কানের গোড়ায় মুখ আনিয়া বলিল, "বড় মজা দা'ঠাকুর—তুমি যদি দেখতে—মাইরি বল্‌ছি, এমন খাসা লাগ্‌ল,—কচি গলা, গাড়ীটাতে টেরও পেলুম্‌নি কোনও কিছুর ওপর দিয়ে যাচ্ছি, বেশ হয়েছে, শালার ছোঁড়ারা যেমন বদ্‌মাস,—রোজ বারণ করি, বলি, 'বাচাধন, যে দিন ধরতে পারব, সে দিন মজাটা টের পাইয়ে দেব।'—এখন, লাও ঠ্যালা।"

অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া নহে, তাহার কথা শুনিয়া বিস্ময় লাগিল।

একটা অতিশয় কালো রুমাল পকেট হইতে বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে সহদেব বলিল, "এক শালার বাবু ধরে' ফেলেছিল আর একটুকুন্ হ'লে দা'ঠাকুর, আরে

কলকেতায় আছি আজ বিশ বচ্ছর—সহদেব কি তেমনি কাঁচা ছেলে!" বলিয়া সে হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

রুমালটা পকেটে রাখিয়া দিয়া আবার বলিল, "পাঁচ সাত শালা তেড়ে এল, দিলে হারামজাদা ব্যাটারা জামাটা ছিঁড়ে, এই দেখ না দা'ঠাকুর—" বলিয়া, সে অত্যন্ত কাতর মুখ করিয়া জামার ছিন্ন স্থানগুলি দেখাইল।

"তার পর এ-গলি, সে-গলি,—লে শালারা এখন কি কর্‌বি কর্‌।" সহদেব অত্যন্ত হাসিতে আরম্ভ করিল, সে হাসি আর থামিতে চায় না।

থক্‌ করিয়া এক ড্যালা থুথু ঠোঁট ডিঙ্গাইয়া চিবুকের উপর গড়াইয়া আসিল,—ডান হাতের জামার আস্তিনটা দিয়া সেটা মুছিয়া ফেলিয়া সহদেব বলিল, "দাও দিগিনি, দা'ঠাকুর, নারকোল দড়িটে এগিয়ে, একবার বিড়িটে ধরাই।"

তাহার কথা কিছু বুঝি নাই;—এতক্ষণ পরে প্রথম জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু সহদেব, ব্যাপারখানা কি বল ত পরিষ্কার করে'?"

প্রচণ্ড এক টানে বিড়ির মাথার আগুনটাকে তলায় নামাইয়া আনিয়া, কণ্ঠস্বর করুণ করিয়া সহদেব কহিল, "আর থাকৃব না এ শালার দেশে, দা'ঠাকুর,—এখানে ভালো মানুষের কদর নেই,—সন্ন্যেসী হ'ব। মাইরি বল্‌ছি, দা'ঠাকুর, আজই রাত্তির বেলা এখান থেকে চলে' যাব, বিবাগী হ'ব।—ওই যে গো তোমার অহীনবাবু না মহীনবাবু, তারই এগারো বারো বচ্ছরের

ছেলেটা, রোজ [illegible]দিয়ে গাড়ী চড়ে' ইস্কুলে যায় আসে। দল আছে আবার ওদের। যখন টিকিট কাটতে যাই, অমনি কোথেকে এসে উঠে পড়ে, টিকিট কাটা রেখে তেড়ে গেলেই ঝুপ করে' নেমে যায়। রোজ বলি, 'যেদিন ধর্‌তে পার্‌ব সেদিন ফাঁদ দেখিয়ে ছাড়্‌ব।' তা ব্যাটাদের ধর্‌তে গেলেই চট্‌পট্‌ সরে' পড়ে। কিন্তু কতদিন আর ফাঁকি দেবে? আজ ধর্‌লুম ওই তোমার অহীনবাবুর ছেলেকে, বাকী সব ক'টা পালাল। বল্‌লুম, 'বাচাধন, এবার কি হয়?' ছোঁড়াটা চোখ রাঙিয়ে বল্‌ল, 'ভালো চাও ত ছেড়ে দাও বল্‌ছি।' আরে, মুনিবের নিমক খাই, রোজ রোজ চালাকি! কিন্তু এত করি শালা মুনিবের জন্যে, তবু বলে, 'তোমাকে দিয়ে কাজ হ'বে না, দুর করে' দেব একদিন।' আর ছোঁড়াটা কি বদ্‌মাইস দেখ দা'-ঠাকুর! একফোঁটা বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর! গাড়ী ছাড়্‌ল ফুল ইস্পিডে, শালার ছেলেকে বল্‌লুম, 'এইবার ঠ্যালাখানা বোঝ্‌'—আস্তে আস্তে ধরে' মার্‌লুম জোরে এক ধাক্কা,—পড়্‌ল চাকার তলায়! রাস্তা গেল লালে:
হুর্‌রে—রে—! দাও দিকিনি, দা'ঠাকুর, একটা কাঁচি সিগ্রেট, একটু মুখ বদ্‌লাই।"

—বাহিরের আকাশ বৈশাখের শুক্‌না মেঘে কালোয় কালো হইয়া গেছে। ঝড়ের সম্মুখের পাতাগুলা উড়িয়া আসে হা হা করিয়া, ধুলার কণাগুলা চোখে মুখে আসিয়া লাগে, যেন কাহাকেও ক্ষমা করিবে না।—

ইহাই নিয়ম

সহদেব সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল। বলিল, 'আজই যাচ্ছি, দা'ঠাকুর, ছিচরণে কত অপরাধ করে' গেনু, কিছু যেন মনে কোরোনি।"

সেই ছেলেটির কথা মনে পড়িল, অহরহ কত ছুটাছুটি করিতে দেখিয়াছি কাছাকাছি রাস্তা দিয়া, সারাদিনের মধ্যে কত অসংখ্যবারই না তার উল্লাসচঞ্চল খেলাধূলা চোখে পড়িয়াছে! উজ্জ্বল, সঙ্কোচহীন, বুদ্ধিদৃপ্ত দৃষ্টি;—সপ্রতিভ হাস্যমুখর বাক্য।

ছাতাটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া অহীনবাবুর বাড়ী গেলাম, থানায় গেলাম। ঘণ্টা-খানেক পরে দারোগা আসিল, কন্‌ষ্টেব্‌ল্ আসিল।

আস্তিন গুটাইয়া সহদেব বলিল, "ওই বজ্জাত বামুন-শালাকে খুন করে' ফাঁসী যাব।"

আকাশে আকাশে মেঘের খেলা, বিদ্যুতের খেলা, স্রেফ্ খেলা, শুধু খেলা,—দুই একটা বাজ পড়ে না, ডাকেও না, আকাশ যায় পরিষ্কার হইয়া! 'অন্নপূর্ণা ষ্টোর্স'-এর পিছনে কালীচরণের শাস্ত্রব্যাখ্যা চলে!

বিচারের দিন, আদালতে গেলাম। বিচারকের পাশে একখানি কেদারায় বসিয়া ছিলেন সবিতা দেবী,—অহীন্দ্রবাবুর স্ত্রী। বছর ত্রিশ বত্রিশ বয়স হইবে মেয়েটির। বহু চিন্তা করিয়া তাহার চোখ দুইটি কোন্ এক শিল্পী গড়িয়াছিলেন,—দুই চোখের দৃষ্টি দিয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে যেন তিনি গ্রহণ করিয়া লইতে পারেন। গভীর কালো তাঁহার দৃষ্টি, তাহার ভাবের কূল যেন পাই-পাই করিয়াও পাওয়া যায় না। সরু তুলির নিপুণ হাতের দুই টানে সবিতার ভ্রূ দুইটি আঁকিয়া তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা বোধ হয় নিজেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু এখন সে চোখের পানে চাহিলে ভয় হয়,—দুইটা চোখের স্থির পলকহীন দৃষ্টি সহদেবের মুখের উপর নিবদ্ধ ছিল। সহদেবের বুকে লাগিল ভয়, লাগিল শঙ্কা। মনে হইতেছিল, ইহার কাছ হইতে লেশমাত্র দয়াও মিলিবে না, ইহার নিকটে ক্ষমার প্রস্তাব বাতুলেও করিতে পারে কিনা

মাথা নীচু করিল।

সবিতা দেবীর চোখের দিকে চাহিয়া আমার বিস্ময় লাগে। সমস্ত হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা তাহাদের পারে আসিয়া থমকাইয়া আছে, সামান্য একটু নাড়া পাইলেই ঝরিয়া পড়িবে। মুখের কথার নানারকম ভাষ্য চলে, সুবিধামতন অর্থ করিয়া লইয়া প্রয়োজন হইলে মনকে চোখ ঠারাও যে না যায়, এমনও

ইহাই নিয়ম

নয়। কিন্তু সবিতা দেবীর সে-দৃষ্টিকে ভুল বুঝিবার উপায় ছিল না। মুখের ভাষার অপেক্ষা ঢের বেশী জোরালো ভাষায় সবিতা সহদেবকে বলিতেছিলেন, "তোমাকে নখে করিয়া সহস্র সহস্র টুকরাতে যদি ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিতাম, তাহার প্রতি টুকরাটিকে যদি অনন্ত নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে হয়ত শান্তি পাইতাম। কিন্তু তাহাও কতটুকু?—"

রায় বাহির হইল, পৃথিবীর বিচারক তাঁহার আইন-কানুন ঘাঁটিয়া এক্ষেত্রে যাহা চরম করিতে পারেন, তাহাই করিলেন,—সহদেব যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তর গেল।

অহীনবাবু সবিতা দেবীকে লইয়া আদালতের বাহিরে আসিলেন, আমার পায়ের উপরে মাথা লুটাইয়া সবিতা পড়িয়া রহিল।

অন্তরে—

সবিতা তাহার ছেলের জামা, কাপড়, শার্ট, প্যাণ্ট্যালুন, জুতা, মোজা ইত্যাদি জড়ো করিয়া লইল। বই, খাতা, পেন্‌সিল, দোয়াত, কলম সব এক জায়গায় গুছাইয়া রাখিল, কুমারের ছোট্ট লাইব্রেরীর সমস্ত বইগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিল, আলমারীগুলার ধূলা সাফ্ করিয়া, কাচ পরিষ্কার করিয়া ঝকঝকে করিয়া তুলিল।

ছেলের জামা কাপড়, ছেলের বই খাতা প্রভৃতি লইয়া মাথায়, মুখে, বুকে, হাতে স্পর্শ করাইয়া সবিতা ধীরে ধীরে ডাকে, "কুমার, কুমার,—খোকা, বাবা আমার, মাণিক আমার, সোনা আমার—"

কুমারের খেলার জিনিষগুলা একত্র করিয়া তুলিয়া রাখিয়া সে আস্তে আস্তে বলে, "খোকা দুষ্টু, ইস্কুলের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে, লাট্টু খেলা এখন থাক্—"

সবিতা নিষ্পলকনেত্রে চাহিয়া থাকে, তাহার বিশাল চোখ দুটি শুক্‌না খট্‌খটে হইয়া আছে, আনাচে-কানাচে কোথাও এক ফোঁটা জলের সন্ধান নাই—কুমার কোন্ ফাঁক দিয়া কেমন করিয়া পালাইবে তাহাই দেখিবার জন্য যেন সে অতিশয় ব্যস্ত।

তাহার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ইলা কাঁদিয়া বলে, "কাকিমা—"

ইলার মাথার উপর নিজের ডান্ হাতখানি রাখিয়া সবিতা দিন কাটায়। একদিন আমাকে আসিয়া বলিল, "দাদা, পুজোর ছুটির সময় আমরা সবাই মধুপুর গিয়েছিলাম,—কুমার কিছুতেই গেল না, বল্‌ল, সবাই ওকে বলে যে, ও নাকি মা'কে ছেড়ে থাকতে পারে না। সেইজন্যই ও এবার আমার সঙ্গে না গিয়ে, কল্‌কাতায় থেকে সকলকে দেখিয়ে দেবে যে, সে কথা সত্যি নয়। আমি কত বোঝালাম, উনি কত বল্‌লেন, কিন্তু দুষ্টু ছেলে কিছুতেই যেতে চাইল না। শেষে ওকে মিহিরের জিম্মায়

রেখে, মিহিরকে ভালো করে' বলে' ক'য়ে উনি, আমি আর ইলা ঠাকুর চাকর সঙ্গে নিয়ে চলে' গেলাম। কিন্তু মোটে চারদিন, তার ভিতরেই আমি উঠলাম অস্থির হ'য়ে, খোকাও তার চিঠিতে লিখ্‌ল, 'মা, তুমি কি শীগ্‌গির আসবে না?'—আমি ফিরে এলাম, খোকাও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারল না, আমিও না।"

সবিতা ম্লান হাসিল, সে যেন হাসি নয়, ঠোঁটের কোণে দাঁড়াইয়া, "আচ্ছা, তা'হলে চল্‌লাম" বলিবার জন্য যেন প্রস্তুত হইয়াই থাকে।

সবিতা বলিল, "খোকা আমায় চিঠি লিখেছিল, তোমায় পড়ে' শোনাব, দাদা?"

বলিলাম, "পড়—"

ব্লাউজের ভিতর হইতে সবিতা একখানা চিঠি বাহির করিয়া বলিল, "আমার কুমার, কত তার বুদ্ধি, লেখাপড়ায় কত তার আগ্রহ! একটু দুষ্টু, একটু দুরন্ত, কিন্তু সকলের জন্যে কত তার টান—"

চিঠিটা খুলিয়া ঠিক করিয়া লইয়া, সবিতা বলিল, "দাদা, তুমি পড়, আমি শুনি—"

পড়িতে লাগিলাম,—শিশু হাতের গোটা গোটা অক্ষর, কিন্তু কোথাও একটা ভুল নাই। পত্রখানির ভিতর দিয়া একটি তীক্ষ্ণধী বালকের হাস্যসমুজ্জ্বল মূর্ত্তিটি বার বার মনে পড়িয়া গেল, চারিদিক হইতে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া সে যেন চোখের সম্মুখে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি পড়িলাম—

"শ্রীচরণেষু,—

মা, তোমাদের পৌঁছা খবর এইমাত্র পেলাম। তুমি আমায় বলে' গিয়েছিলে ত যে আমি যেন তোমার চিঠি পাওয়ামাত্রই উত্তর দিই,—সেইজন্যেই এক্ষুনি তোমার চিঠির উত্তর দিচ্ছি। নইলে খেয়ে দেয়ে তারপরে দিতাম। তুমি আরও বলেছিলে ত, আমি যেন সমস্ত দিনের সব কথা লিখি, একটুও যেন বাদ না দিই। তাই লিখ্‌ব,—তুমি দেখো।

তোমরা ত চলে' গেলে সাড়ে-আটটার সময়, তারপর মিহির-দা' একটি পরামাণিক ডেকে নিয়ে এসে চুল কাটতে বস্‌লেন, সাড়ে-ন'টার সময় চুলছাঁটা শেষ হ'ল, এবার স্নানের পালা। আমি বিষ্টুদের বাড়ী গেলাম ক্যারাম্ খেলতে। প্রায় সাড়ে-দশটার সময় ফিরে এসে দেখি মিহির-দা' বৈঠকখানা-ঘরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন, আর ঝি এসে রান্নাঘর ধোয়া আর উনুনের ছাই তোলা আরম্ভ করে' দিয়েছে। বুঝলাম্, মিহির দা'র খাওয়া হ'য়ে গিয়েছে।

ঝি'র ঘর ধোয়া শেষ হ'লে আমি হাঁড়িটা দেখ্‌তে গেলাম তার ভিতরে কি আছে। একটা থালাতে ভাত, ডাল, ডিম-ভাতে, আর আলু-ভাতে নিয়ে খেতে বস্‌লাম। লছমী সিং তোমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে ফিরে এল। আমি বল্‌লাম, 'লছমী সিং, তোম্‌হারা আজ ছুট্টি, যাও—তব্ সাঁজ্‌কা বাখৎ ফির্‌কে আও, হাম্ ভাসান দেখ্‌তে যায়েগা।'

লছমী বল্‌ল, "বহুৎ আচ্ছা, খোকাবাবু"—বলে' চলে' গেল।

আচ্ছা মা, ঠিক করে' বোলো ত, আমি যে হিন্দীতে লছমীর সঙ্গে কথা কইলাম, সে-হিন্দীটুকু ঠিক হ'য়েছে কি না।

মা, তুমি যেন এ হিন্দীর কথা কাউকে বোলো না, বিশেষ করে' দিদিমণির কানে যেন না যায়। সেবার ত ও-ই শুধু শুধু আমার হিন্দী নিয়ে ঠাট্টা করেছিল, বলেছিল না, 'খোকা, তুই একটা হিন্দীতে বই লেখ্ ভাই, আমি কাকাকে বলে' সেটা ছাপিয়ে দেব?'

—সেইদিন থেকেই ত আমি লছমী সিং ওদের সঙ্গে পর্য্যন্ত বাংলায় কথা কই। কিন্তু সেদিন আমি কি বলেছিলাম জান, মা?

—লছমী সিং এসে আমায় বল্‌ল যে, বাবা ওকে শ্যামবাজার পাঠাচ্ছেন, কিন্তু ও জানে না যে, কোথায় গিয়ে ট্র্যামে চড়্‌বে। দিদিমণি আর আমি তখন অঙ্ক কষ্‌ছিলাম। আমি লছ্‌মীকে বল্‌লাম, 'দেখ লছমী সিং, বড় রাস্তাকা মোড়পর গিয়ে',—বলেই দেখি যে দিদিমণি আমার দিকে খুব ভালমানুষের মত তাকিয়ে যেন হাস্‌বার জন্য একেবারে রেডি হ'য়ে রয়েছে।

আমি ঘাব্‌ড়ে গেলাম, তারপর যা থাকে কপালে ভেবে, খুব জোরের সঙ্গেই বলে' উঠ্‌লাম, "শ্যামবাজারকা গাড়ীপর্ উঠে পড়।' অম্‌নি দিদিমণি যেন হাসির চোটে ফেটে পড়্‌ল, আর তার ফলে যা হ'য়েছে তা ত তুমি জানই মা!—দিদিমণির ক্লাশের মেয়েরা আমার হিন্দীর কথা শুনেছে, বাবার বন্ধুরা সবাই শুনেছেন, তোমার বন্ধুরা শুনেছেন। দিদিমণি যত

লোককে চেনে, সকলকে বলেছে! ভয়ানক মেয়ে মা ও! ওকে যেন তুমি কোনমতেই এবারকার হিন্দীর কথা বোলো না, তাহ'লে কল্‌কাতায় ফিরে, ও আর আমায় আস্ত রাখ্‌বে না।

আমি আর হিন্দী বল্‌তামও না ওর ভয়ে,—কিন্তু তখন দেখলাম কি, কেউ কোথাও নেই, তাই ভাব্‌লাম এই ফাঁকে যদি একটু হিন্দী শিখে ফেল্‌তে পারি তাহ'লে তোমরা ফির্‌লে পরে দিদিটাকে আচ্ছাজব্দ করা যাবে।

—আচ্ছা, তুমি বল ত মা, ওই হিন্দীটুকুর ভিতরে কি কোনও ভুল হ'য়েছে? বোধ হয় হয়নি, না?

কিন্তু আমার খাওয়ার কথা বল্‌তে বল্‌তে থেমে গেলাম—বেশ মজা, না?

—আমার খাওয়া শেষ হ'ল। গয়লা দুধ নিয়ে এল, আমি কড়াটা দিলাম, গয়লা দুধ দিয়ে গেল। কিন্তু দুধ গরম কর্‌ব কি করে'? উনুন ত ঝি বেশ পরিষ্কার করে' রেখেছে।—আমি বিষ্টুদের বাড়ী গেলাম, লীলাকে ডেকে জিজ্ঞেস কর্‌লাম, ওদের বাড়ীর উনুনে আগুন আছে কি না। লীলা বল্‌ল যে আছে, কিন্তু এখনও রান্না শেষ হয়নি—যখন শেষ হ'বে তখন দুধ নিয়ে যাবে গরম কর্‌বার জন্যে।

আমি রান্নাঘরে দুধটা ঢাকা দিয়ে রেখে ঝি'র বাসন মাজা শেষ হ'য়েছে দেখে বল্‌লাম, 'পচার মা, বাসনগুলো ওপরে দিয়ে যাও, আর রান্নাঘরের কোণে কালকের রাত্তিরের লুচি আছে নিয়ে যাও।'

ঝি বাসন রেখে গেল, লুচি নিয়ে গেল।

মিহির-দা'র ঘুম তখনও ভাঙেনি।

আমি লাইব্রেরী-ঘরে অঙ্ক কষ্‌তে বস্‌লাম। বেলা তখন বোধ হয় একটা, নীচে বৈঠকখানা-ঘর থেকে চেয়ার সরানোর যে-রকম শব্দসাড়া উঠ্‌তে লাগল, তাতে আমার মনে হ'ল যে, মিহির-দা' নিশ্চয়ই উঠেছেন। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে লীলা বল্‌ল, 'মিহির-দা, খোকা বল্‌ছিল দুধ গরম কর্‌বার কথা। আমাদের উনুন এতক্ষণে খালি হ'ল, দুধটা এনে দিন।' আশ্চর্য্য হ'য়ে মিহির-দা' বল্‌লেন, 'দুধ? এঁ্যা, দুধ কি দিয়ে গিয়েছে নাকি?'

লীলা বল্‌ল, 'হ্যাঁ, দিয়ে গিয়েছে ত, আপনি এনে দিন।'

মিহির-দা' খুব সম্ভব রান্নাঘরে গিয়ে দুধটা এনে দিলেন।

খানিক বাদে লীলা এসে আবার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বল্‌ল, 'মিহির-দা' দুধ কেটে গেল, তা মা জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন, একটুখানি মিষ্টি দিয়ে ওই দুধটুকু কি জ্বাল দিয়ে ঘন করে' দেবেন?'

উত্তর না দিয়ে মিহির-দা' ডাক্‌লেন, 'খোকা, খোকা'—

লাইব্রেরী থেকেই চেঁচিয়ে বললাম, 'কি?'

'শুনে যাও—'

বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হ'তেই মিহির-দা' বল্‌লেন, ভাঁড়ার ঘরের কোথায় চিনি থাকে জান ত?'

আমি বল্‌লাম, 'আমি ঠিক জানি না ত'—তারপর লীলাকে

বল্‌লাম, 'লীলা ভাই, সইমা'কে ওটা চিনি দিয়ে জ্বাল দিয়ে দিতে বলো গে'—

লীলা লাফাতে লাফাতে চলে' গেল, আমিও ফিরে এসে লাইব্রেরী ঘরে বস্‌লাম।

তুমি ত জান মা, মিহির-দা'কে আমার একটুও ভালো লাগে না। এই যে কিছু দিন আগে, দেশের থেকে বাবা গড়খালি যাচ্ছিলেন প্রজাদের সঙ্গে কি একটা মারামারি না কি হ'য়েছে শুনে, তখন ত আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম, না?—সেখানে যেতে সবাই বাবাকে বল্‌ল যে, মিহির-দা' নাকি শুধু শুধু সব লোকেদের ঘরদোর জ্বালিয়ে দিয়েছেন, দরোয়ানদের দিয়ে তাদের জিনিষপত্তর লুঠ করিয়েছেন, তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করেও নাকি মিছিমিছি সব বলেছেন যে তারা টাকা দেয়নি।

বাবা সব শুন্‌লেন, নায়েব-মশাইকে ডেকে সব জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন, গড়খালির মোড়ল-মশাইকে ডেকে পাঠালেন, শেষে মিহির-দা'কে খুব বকে' দিলেন। কিন্তু এসব ত তুমি শুনেছই, মা। এবার তুমি যে কথা জান না, সে কথা বল্‌ব।

যেদিন বাবা মিহির-দা'কে বক্‌লেন, সেইদিন বিকেলবেলা বাবা গিয়েছিলেন চরণপুর, আমি ছাদের ওপর বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘাটের কাছে একটা ছেলের চীৎকার শুন্‌তে পেলাম, 'ওগো বাবু গো, আর কর্‌ব না গো, মরে' গেলুম গো—।' আর একটা লোক বল্‌ছে, 'এবার ছেড়ে দিন বাব. আর করবে না বাবু—।'

কি হয়েছে দেখবার জন্যে আমি দৌড়তে দৌড়তে নীচে নাম্‌লাম, তারপর তিন লাফে ঘাটের কাছে গিয়ে হাজির হ'লাম। গিয়ে দেখলাম যে, মিহির-দা' দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর পায়ের কাছে পড়ে' একটা বুড়ো মুসলমান খুব কাঁদছে, আর কাশিম খাঁ খুব জোরে জোরে একটা ছেলের পিঠে জলবিছুটি লাগাচ্ছে। আমায় দেখে কাশিম একটু থাম্‌ল। আমি অবাক হ'য়ে মিহির-দা'কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হ'য়েছে মিহির-দা' ?'

মিহির-দা' কিছু বল্‌বার আগেই সেই বুড়ো মুসলমানটা একেবারে হাঁউমাউ করে' উঠ্‌ল, আর আমার পা-দুটো জড়িয়ে ধরে' একসঙ্গে অনেক কথা বলে' ফেল্‌ল।

ক্রমে ক্রমে আমি বুঝ্‌লাম যে, তার নাম আহম্মদ শেখ, তার ছেলে ঘাটের পাশের গোলাপ গাছ থেকে আজ দুপুরে দুটো গোলাপ ফুল ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেই কথা জান্‌তে পেরে ম্যানেজার-বাবু রহমান্‌কে ধরে' এনে জলবিছুটি লাগাচ্ছেন।

খুব রেগে গিয়ে আমি মিহির-দা'র দিকে তাকিয়ে বল্‌লাম, 'বেশ করেছে, গোলাপ ফুল নিয়েছে, আরও নেবে, রোজ নেবে, আপনি তাতে জলবিছুটি লাগাবার কে ?'

তারপর কাশিম খাঁ'র হাত থেকে জলবিছুটিটা কেড়ে নিয়ে বল্‌লাম, 'ফের্ যদি আপনি কাকেও মারধোর করেন, তাহ'লে আমি বাবাকে বলে' এইটে দিয়ে পিটুতে পিটুতে আপনাকে থানায় দিয়ে আস্‌ব।'

চেয়ে দেখি কাশিম আর সেই ছেলেটা, দুজনেই কখন সরে' পড়েছে। মিহির-দা'ও কিছু না বলে' চলে' গেলেন,—আমার ওপর খুব রেগেছিলেন, বোধ হয়। বুড়ো কেবল তখনও ছিল আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্যে। সে যা আনন্দের চোটে করতে লাগ্‌ল মা, আমায় সমস্ত পৃথিবীটা দিতে বল্‌তে লাগল তার খোদাতালাকে, আর এমন করে' বল্‌তে লাগ্‌ল যে, আমি ভাব্‌লাম লোকটা বুঝি-বা ক্ষেপেই গেল! আমি শুধু বল্‌লাম, 'আচ্ছা হ'য়েছে হ'য়েছে,—তুমি রহমান্‌কে বোলো সে যেন রোজ ফুল নিয়ে যায়, ভয় পায় না যেন।'—

তবু কি সে যেতে চায়! কত করে' তবে তার হাত থেকে ছাড়া পেয়েছিলাম।

তুমি আমায় প্রায়ই বল না, মা,—'খোকা, দুঃখীর দুঃখ দূর করিস্‌ বাবা, নিজের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রেখে, যখন ব্যথিতের চোখের এক ফোঁটা জল মুছিয়ে দিবি, তখন ভগবানের দরবারে তোর নামে এমন একটা জিনিষ জমা হ'য়ে থাক্‌বে যার তুলনা এ পৃথিবীতে কোথাও মিল্‌বে না?'—

তোমার মুখে কোন কথা একবার শুন্‌লেই ত সেটা আমার মুখস্থ হ'য়ে যায়। তোমার কোন কথা আমি ভুলি না ত, আর একথা ত তোমার কাছ থেকে কতবার শুনেছি। কিন্তু কিচ্ছুটি বুঝিনি ;—'ভগবানের দরবার' কি? 'স্বার্থ' কাকে বলে? কি জমা হ'বে? কিচ্ছু বুঝি না। কিন্তু তোমার মুখে শুন্‌তে এত ভালো লাগে! আচ্ছা মা, বল ত, সেদিন কি ভগবান তুষ্ট

হয়েছিলেন ? আর ভগবান তুষ্ট হয়েছিলেন কি না, তা আমি জান্‌তেও চাইনে,—তুমি সেদিনকার কথা শুনে খুসী হচ্ছ কি না বল ত, মা-মণি !—"

সবিতা কহিল, "আমি খুসী হয়েছি খোকা—ভগবানও হয়েছেন,—সোনা আমার, মা'র সব কথা তোর মনে থাকে ?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

সবিতা বলিল, "থাম্‌লে কেন, দাদা ? পড়ো—"

আমি আবার পড়িতে লাগিলাম,—"কিন্তু আমি আবার আমার চিঠির মাঝখানে থেমে গিয়েছি,—খুব অদ্ভুত, না ? —তোমাকে এতদিন এ কথা বলিনি কেন জান ? আমার রোজ ইচ্ছে করত, তোমাকে বলি, কিন্তু ভারী লজ্জা করত, সেইজন্যই বলিনি, আজকে ত বল্‌লাম। আগে বলিনি বলে' তুমি যেন দুঃখ কোরো না লক্ষ্মীটি মা।—একথা ছাড়া আর সব দিন ত সব কথা তোমাকে বলেছি। তুমি যেন রাগ কোরো না, মা-মণি।—

"আমি লাইব্রেরী-ঘরে গিয়ে অঙ্ক করতে বস্‌লাম। বেলা তখন দুটো। বিষ্টুদের বাড়ী বিষ্টুকে ডাকতে গেলাম, বাইরের ঘরে দেখলাম মিহির-দা' ঘুমোচ্ছেন।

বেলা তখন বোধ হয় সাড়ে-তিনটে, আমি বিষ্টুদের বাড়ী থেকে ফিরে এলাম, মিহির-দা' তখনও ঘুমোচ্ছেন !

রামায়ণের কুম্ভকর্ণ ত ছ'মাস ঘুমোত, সে ত আর এখন বেঁচে নেই, কিন্তু যদি সে এখন থাকৃত আর তার সঙ্গে

মিহির-দা'র ঘুমের কম্পিটিশান হ'ত, তাহ'লে কে জিত্‌ত বল ত!—আমি বল্‌ব?—মিহিরদা'।

আমি আবার অঙ্ক কষ্‌তে বস্‌লাম। চারটে বাজে, আমার ক্ষিধে পেয়েছে। ঝি ত আসেনি, খাবার আনবে কে? ভাব্‌তে ভাব্‌তেই ঝি এল। ও অনেকদিন বাঁচ্‌বে, না মা?—আমি টাকা দিলাম, ও খাবার নিয়ে এল। কিচ্ছু ভেবো না, মা, মুখুয্যেদের দোকান থেকেই এনেছে। আমার খাওয়া শেষ হ'ল। জলের গেলাস নিয়ে এসে ঝি জিজ্ঞেস কর্‌ল, 'খোকাবাবু, দুধ ত ছানা হ'য়ে রয়েছে, কিন্তু ওটাকে চিনি দিয়ে ঘন কর্‌ল কে?'

আমি বল্‌লাম, 'সইমা।'

বুঝ্‌লাম যে লীলা ওটা একসময় দিয়ে গিয়েছে। বিষ্টুকে জিজ্ঞেস্ কর্‌তে গেলাম যে, ওরা কখন ভাসান দেখ্‌তে যাবে। মিহির-দা' ঘুমোচ্ছেন।

বেলা সাড়ে-পাঁচটা, বাড়ী ফিরে এলাম, মিহির-দা' খবরের কাগজ পড়ছেন। লছমী সিং এখনও ফেরেনি।

সন্ধ্যে ছ'টা, মিহির-দা' ভাসান দেখ্‌তে বার হ্‌লেন। একটু পরেই বিষ্টু, লীলা, খুকু, বিশু, রুচি ওরা সব হুড়মুড় করে' লাইব্রেরী-ঘরে এসে ঢুক্‌ল, সবকটাতেই একসঙ্গে চীৎকার করে' উঠল, 'খোকা, শীগ্‌গির কর, বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমরা ভাসান দেখতে যাব।'

আমি দেখ্‌লাম, লছমী সিং-এর জন্যে বসে থাকলে চল্‌বে না। চট্‌পট্‌ করে' কাপড়, জামা, জুতো পরে' বিষ্টুদের সঙ্গে

৮

ইহাই নিয়ম

ঠাকুর দেখ্‌তে বেরোলাম, গেটে তিনটে তালা দিয়ে। বেরোবার আগে একবার বৈঠকখানা-ঘরটার ভিতরে ঢুক্‌তেই দেখ্‌তে পেলাম, একটা কাচের গেলাসে আধ-গেলাস জল, সেটা মেঝেতে পড়ে' রয়েছে,—মিহির-দা' জল খেয়ে রেখে গিয়েছেন বোধ হয়। তক্তপোষগুলোর উপর আর মেঝের উপর কতকগুলো বাংলা খবরের কাগজ ছড়ান। ঘরের কোণে সেই যে মান্ধাতার ঢের আগের আমলের টেবল্‌টা আছে, তার ওপরে-পাতা খবরের কাগজগুলোতে অনেক পান আর চূণের দাগ। বাংলা খবরের কাগজগুলো 'হোয়াট-নট্'টার নীচের তাক থেকে 'পড়ি-পড়ি' কর্‌ছে। কতকগুলো জুতোর পাটি ঘরময় ছড়ান। মিহিরদা'র বড্ড দামী ভাঙা আয়নাটার খোঁজ নেই, বোধ হয় তক্তপোষের তলায় পড়ে' গিয়েছিল। কৌচটার ওপর কতকগুলো মোজা গেঞ্জির খালি বাক্স ছড়ান।—মিহির-দা' কিন্তু একটু অপরিষ্কার আছেন, না মা?

আমরা ভাসান দেখ্‌তে গেলাম। যখন বাড়ী ফিরে এলাম, তখন সাড়ে-আটটা হ'বে। দরজার তালা সবেমাত্র খুলেছি, এমন সময় মিহির-দা' এসে বল্‌লেন, 'খোকা, তুমি এই আস্‌ছ? আমি অনেকক্ষণ এসেছি, দরজায় তালা দিয়ে গিয়েছিলে, তাই ধীরেশবাবুদের বৈঠকখানায় বসে' গল্প কর্‌ছিলাম।'

কাপড় জামা ছেড়েই তাড়াতাড়ি সইমা'কে বিজয়ার প্রণাম কর্‌তে ছুটলাম। সেখানে খানিকক্ষণ হুটোপাটি কর্‌লাম। বাড়ী ফিরে এসে শুন্‌লাম যে, পিসিমা খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আবার একটু খাবার খেলাম। তারপর এই ভেবে রান্নাঘরে ঢুকলাম যে, জাল-দেওয়া দুধটুকু খাব। কিন্তু দেখলাম, কড়াইটা বেশ পরিষ্কার, আর তার ভিতর জল ঢালা রয়েছে! মিহির-দা' খেয়ে গিয়েছেন নিশ্চয়! আমার বেশ হাসি পেল! মিহির-দা' কিন্তু বেশ লোভী আছেন, না?

লছমী সিং বাইরে থেকে ডাক দিল, 'খোঁকাবাবু—'

আমি বারান্দায় বেরিয়ে হিন্দীতে বল্‌লাম, 'লছমী সিং, তোমায় না আমি সন্ধ্যের আগে ফিরতে বলেছিলাম?'

লছমী সিং অনেক কাকুতি মিনতি করে' বল্‌তে লাগ্‌ল যে অনেকদিন পরে তার কোন্ এক 'দেশ্‌কা আদমী'র সঙ্গে নাকি দেখা, সে কিছুতেই ছাড়্‌তে চায় না, তাই দেরী হ'য়ে গিয়েছে। তার অন্যায় হয়েছে, এমন আর কোন দিন হ'বে না, এইবারটা খোকাবাবু তাকে মাফ করুন।

লছমী সিং চলে গেল। আমি হাত পা ধুয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম।

—বিজয়ার দিন সকালবেলা ত তোমরা গিয়েছ, এই ত সেদিনকার সমস্ত খবর। তুমি আমায় বলেছিলে ত সমস্ত দিনের সব কথা লিখ্‌তে। ঠিক তাই লিখেছি। কিচ্ছুটি যে বাদ দিয়েছি সে কথা আর কাউকে বল্‌তে হয় না। কিন্তু চিঠিটা কত বড় হয়েছে দেখেছ, মা?—

তোমরা কেমন আছ? আমি ভালো আছি। তুমি আমার বিজয়ার প্রণাম, ভালবাসা, ভক্তি সব নিয়ো। বাবাকে আমার

বিজয়ার প্রণাম দিয়ো। দিদিমণিটাকে দেবে?—আচ্ছা দিয়ো। দিদিমণির কাছে যে চিঠিটা লিখ্‌লাম, সেটা ওকে দিয়ো। ঠাকুর, ঝড়ুয়া, কেষ্টা, ওদের সবাইকে বোলো যে, খোকাবাবু বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়েছে। চিঠি পাওয়ামাত্র উত্তর দিয়ো।—

মা, আমার বড্ড মধুপুর দেখ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। আমি ত দু'তিনবার মধুপুর গিয়েছি, কিন্তু তবু আমার এবারও যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। তোমার জন্যে মন-কেমন কর্‌ছে বলে' যেতে চাইছি না,—আমি এখানে থাক্‌তে পারি, তোমার জন্যে কষ্ট হচ্ছে, তবু আমি থাক্‌তে পারি। তুমি যদি মধুপুরে যেতে বল তবে আমি যাব মিহির-দা'র সঙ্গে। একথা কিন্তু আর কাউকে বোলো না যেন।

—তোমার খোকা

পুঃ—আচ্ছা মা, তোমরা যদি এখন ফিরে আস, তাহ'লে ত এর পরে বড়দিনের ছুটির সময় আমরা সবাই মধুপুর যেতে পারি,—আমিও সুদ্ধু। বড়দিনের সময় যদি আবার যাওয়া হয় তা'হলে মিছিমিছি ওখানে এখন বেশীদিন থেকে আর কি হবে? তোমরা কালই চলে' আসতে পার্‌বে না?

—তোমার খোকা

পুঃ—মা, তুমি কি শীগগির আসবে না?

—খোকা"

পত্র পড়া শেষ করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। আমার কিছু বলিবার ছিল না। কোন কথা না বলিয়া সবিতা আমার হাত

হইতে চিঠিখানা গ্রহণ করিয়া সযত্নে ভাঁজ করিতে করিতে উঠিয়া গেল।

আমার মনে হয়, কুমার যেন অকস্মাৎ সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিবে, লঘুচরণে আসিয়া সবিতাকে বলিবে, "মা, তোমায় ছেড়ে আমি থাক্‌তে পারি,—বড় হয়েছি কিনা, সেইজন্যে—তোমার জন্যে মন-কেমন করে, তবু আমি থাক্‌তে পারি। আমি এসেছি, তোমার জন্যে বড্ড কষ্ট হয়, কিন্তু সেজন্যে আসিনি,—এই এলুম, এখ্‌নি—"

কুমার চলিয়া গেল,—সহদেবের দ্বীপান্তরবাসের সঙ্গে সঙ্গেই সবিতার বাহিরের দুঃখও যেন আর তিল মাত্র অবশিষ্ট রহিল না। তাহার অন্তরের মন্দিরে আজ শিশুদেবতার পূজা চলে। উপকরণ সব কুমার নিজেই রাখিয়া গিয়াছে,—তাহার জুতা, মোজা, তাহার খাতা, বই, দোয়াত, কলম, তাহার মাতৃস্নেহ-লোভাতুর মন, তাহার সব-ভুলান "মা" ডাক। আয়োজনের ত্রুটি নাই, নিষ্ঠারও অভাব হয় না। কিন্তু সবিতার চোখে রাস্তার পাশে পাশে কুমারের রক্ত দেখা যায়। বোন আমার শান্তি পায় না।

তারপর সেই আগেকার মতনই দিন কাটিয়া যায়, পুরাপুরি চব্বিশ ঘণ্টাই লাগে, না কম, না বেশী। কিন্তু আমি সবিতার দাদার স্থান জুড়িয়া থাকি।

আমার কাঠখোট্টা চোখে জল আসে। ছোট্ট ছেলেটি, হাসিমুখে আসিত, বলিত, "পাঁচ পোয়া আলু চাই।"

দাম ধরিতাম, আমার কেনা দামের অপেক্ষাও কম। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীর দাম, আমার লোকসানের দাম তাহার হাসির মূল্যে শোধ পাইয়াছি।

স্বামী-তীর্থ

ছোট মেয়েটা সকাল হইতেই 'জুতা ব্রুশ' খাওয়ার জন্য বায়না ধরিয়াছিল। রাস্তা দিয়া কোন জিনিষই ডাকিয়া যাইবার জো নাই,—ভাঙ্গা ঘটি বাটি সারানওয়ালা গলি দিয়া ডাকিয়া গেলে, সে তাহাই খাইতে চাহিবে,—'চুড়ি চাই, বালা চাই' ডাকিলে, তাহাও তাহার খাওয়া চাই,—মুচি যদি 'জুতা ব্রুশ' বলিয়া হাঁকিয়া যায়, তাহা হইলে দৌড়াইয়া আসিয়া মায়ের আঁচল ধরিয়া নাছোড়বান্দা হইয়া বলে, "মা, 'জুতো ব্রুশ' খাব!"—

গলির মোড়ের রোয়াকটিতে বসিয়া বসিয়া দেখে, একজন পরামাণিক হাতে বাক্স ঝুলাইয়া নিঃশব্দে চলিয়া যায়,—জিজ্ঞাসা করে, "তোমার হাতে ওটা কি?" উত্তর পায়, 'বাক্স।" ছুটিয়া বাড়ীতে গিয়া বলে, "মা, বাক্স খাব।"

সমস্ত পৃথিবীর সহিত তাহার একটি সহজ সম্বন্ধ আছে এবং সেটা উদরের সম্বন্ধ,—ইহা ছাড়া আর কোন ধারণাই তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কটিতে প্রবেশ করে না।—

কন্যার পিঠের উপর ঠাস্ করিয়া একটা চড় বসাইয়া দিয়া মাতা কহিলেন, "পাজী মেয়ে, কেবলই 'খাই খাই'—'জুতো ক্রুশ খাব', খেয়ো'খন জুতো ক্রুশ—আজ ভাল করে' খাওয়াব—"

বারান্দার মাথায় শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণীকে আসিতে দেখিয়া বধূর কন্যাকে শাসন করিবার স্পৃহা মুহূর্ত্তে বিলীন হইল,—জোরে জোরে মশ্‌লা বাটিতে লাগিল। মেয়ে পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "মা মশ্‌লা খাব।"—হতাশ হইয়া মাতা ফিস্ ফিস্ করিয়া তর্জ্জন করিলেন।

কিন্তু শাশুড়ীর চোখ এড়াইল না,—অগ্রসর হইয়া আসিয়া নাত্নীকে কোলে তুলিয়া লইয়া তিনি কহিলেন, "ছেলে মেয়ে আমাদেরও একদিন ছোট ছিল মেজ-বউ, বায়না তারাও কর্‌ত,—কিন্তু এ-রকম লুকিয়ে লুকিয়ে ছেলে ঠেঙিয়ে বাইরে ভালমানুষির ভড়ং কর্‌তে আমাদের বাপ-চোদ্দপুরুষও কখনও পার্‌ত না।"

বধূ হেঁটমুখে নিজের কাজ করিতে লাগিল,—কোন উত্তর দিল না।

বড়লোকের ঘরের কন্যা,—অতএব অদিতির এই গৃহে পড়িবার খুব সঙ্গত কোন কারণ ছিল না। কিন্তু সব সময়ে

সকল জিনিষের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নহে, এবং এক্ষেত্রেও সেটা অনায়াসসাধ্য হইবে না।

মোটের উপর ধনী এবং সম্ভ্রান্ত পিতার কন্যা অদিতি এই সর্ব্বপ্রকারে একান্ত দরিদ্রের গৃহে একদিন বধূবেশে প্রবেশ করিল এবং পিত্রালয়ে একদিনের জন্যও আর ফিরিল না।

কিন্তু দুঃখ সেজন্য নহে,—সর্ব্বপ্রকার অভাবের আবহাওয়ার মাঝে নিজেকে মিশ খাওয়াইয়া লওয়ার মত এমন একটি স্বচ্ছ মনের গতি মেয়েটির মধ্যে ছিল যে, কোনও পরিশ্রমেই তাহার মুখ কালো হইয়া উঠিত না।

স্বামীর নাম বিশ্বতোষ—যদিও তুষ্ট সে বড় একটা কাহাকেও করে নাই, বিশ্ব ত ঢের দূরের কথা!

বিবাহের পূর্ব্বে তাহার চেহারা যেন অন্যরকম ঠেকিত। অদিতির পিতা পবিত্রকুমার বিশ্বতোষের বিনয়নম্র ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন,—তাঁহার মতে, আজকালকার দিনে এইরূপ চরিত্রের পাত্র পাওয়া নাকি একান্ত দুর্ঘট ছিল! পিতার এই সিদ্ধান্তই অদিতিকে স্বামী-সৌভাগ্যবতী করিয়া তুলিল। —ইহা ছাড়া অদিতির এই গৃহে আগমনের আর কোন সহজ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

শ্বশুর এবং শাশুড়ীতে সেদিন দ্বিপ্রহরে তুমুল কলহ বাধিয়াছিল। শাশুড়ী কহিতেছিলেন, "কাল সকালে তুমি

যখন কলতলায় আঁচাচ্ছিলে, তখন শঁকৃড়ি জল ছিট্‌কে এসে চৌবাচ্চার গায়ে লেগেছিল—সেই চৌবাচ্চার জল দিয়ে আজ চান্ করে' এসে লেপ, তোষক ছিষ্টি ছুঁয়ে দিলে ত! এই বিষ্টির দিনে এই সব ধুয়ে শুকোতে গা-গতরের কি অবস্থা হ'বে সেটুকুন বিবেচনাও কি এই বয়সে হ'ল না গা!—বুড়ো হ'য়ে মরতে চল্‌লে, আক্কেল আর গজাবে কবে?"

বিছানাটা ভালো করিয়া পাতিয়া লইয়া, হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া শ্বশুর মহাশয় বলিলেন, "আমি গরীব মানুষ, এসব লেপ তোষক ধুয়ে বর্ষার দিনে পচ্‌তে দেবার মতন অবস্থা আমার নয়!"—বলিয়া হঠাৎ তিনি কি ভাবিয়া উঠিয়া বসিলেন, দ্রুতগতিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাকী সমস্ত বিছানাগুলা, কম্বল, বালিশ, কাঁথা, কাপড় প্রভৃতি হাত দিয়া স্পর্শ করিতে করিতে কহিলেন, "এই ত সমস্তই ছুঁয়ে দিলুম,—দেখি তুই কি করিস্!"

রুদ্ধরোষে ফুলিতে ফুলিতে শাশুড়ী বলিলেন, "মর্ মিন্সে, তুই-তোকারি করিস্ কেন?"

শ্বশুরমহাশয় পরিতোষবাবু তখন ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আর কোন্ জিনিষ স্পর্শ করিলে স্ত্রীকে বেশ খানিকটা জব্দ করা যাইবে তাহাই ভাবিতেছিলেন;—এক ধারে একটা পুরানো ষ্টীলট্রাঙ্ক ছিল,—হঠাৎ অগ্রসর হইয়া আসিয়া সেইটার উপরে হাত রাখিলেন, তাহার পর দ্রুতপদে আসিয়া সহধর্ম্মিণী নয়নতারার চুলের গোছাটা শক্ত করিয়া ধরিলেন,—ভীষণ-ভাবে হাসিয়া পিঠে একটা কিল বসাইয়া দিয়া কহিলেন, "এই ত

তোকেও ছুঁয়ে দিলুম,—এইবার এই বাদ্‌লার দিনে আবার চান্ করে' মর্‌গে যা, হারামজাদী!"

এইবার নয়নতারার মুখ ছুটিল,—সে কি ভাষা! সে কি গালাগালি!

পরিতোষবাবু বিছানায় গিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। নয়নতারার দিকে চাহিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তভাবে হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন, "তোর বাবার বিছানা?—এ সব তোর বাবার জিনিষ, যে তুই নষ্ট কর্‌বি?" বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন,—মিনিটখানেকের মধ্যেই সিংহনাদের ন্যায় তাঁহার নাসিকাগর্জ্জন শোনা যাইতে লাগিল। নয়নতারা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু ও-তরফ হইতে আর প্রত্যুত্তর আসিল না।

—এই ভাষা, এই আচরণ পূর্ব্বে অদিতিকে পলে পলে আক্রান্ত করিত,—সে প্রাণপণে চোখ বুজিয়া কানে আঙুল দিয়া থাকিত। এখন সে নিয়ত মনে করিতে চেষ্টা করে যেন এ সকল ঘটনা, এ সকল কুৎসিত বাক্য তাহার গা-সহা হইয়া গেছে,—কিন্তু কোথা হইতে দুস্তর লজ্জা আসিয়া তাহার মাথা হেঁট করাইয়া দেয়।

শৈশবের সংস্কার মানুষের মনে যে শৃঙ্খলের সৃষ্টি করে, তাহার বাঁধন কাটাইয়া বাহির হওয়া একেবারে অসম্ভব না হইলেও যথেষ্ট পরিমাণে কঠিন।—অদিতি মনে মনে বলে, আমি এ গৃহের বধূ, আমার এ ভদ্রতার এবং রুচির বিলাস

কেন ? আমিও ইহাদেরই একজন,—ইহাদের ভিতরে পৌঁছিবার সহজ রাস্তাটি জানিতাম, অভিমন্যুর ন্যায় ব্যূহপ্রবেশে কোন বাধাই তাই হয় নাই,—কিন্তু এখান হইতে বাহির হইবার পথ এখনও জানি না,—সে মন্ত্র আজও শিখি নাই,—অতএব নীতির আড়ম্বর আমায় সাজে না।

—শাশুড়ী আসিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিলেন, "আমি চান্ করে' এসেছি মেজ-বউ—তুমি ও-ঘর থেকে বালিশবিছানা-গুলো সব বা'র করে' নিয়ে এস দিকিনি বাছা,—প্যাঁট্রাটাও এনো,—শব্দ-টব্দ যেন না হয়, মিন্সের ঘুম ভেঙে গেলে আবার কেলেঙ্কারী বাধাবে।"

. অদিতি বিনাবাক্যব্যয়ে অগ্রসর হইতেই কাছে আসিয়া কহিলেন, "আর দেখ, অম্‌নি ওর মাথার বালিশটাও নিয়ে এসো,—আস্তে আস্তে কোণটা ধরে' টেনো, ওর ঘুম ভাঙ্‌বে না,—ও ত নাক-ডাকা নয় যমের ডাক,—এত লোক মরে, এ হতচ্ছাড়ার কি মরণ নেই গা ?—আমার যে তাহ'লে হাড়ে বাতাস লাগে !"

ভীতকণ্ঠে অদিতি কহিল, "কাজ নেই মা ও-বালিশটা এনে,—যদি জেগে ওঠেন—"

তীব্রভাবে নয়নতারা বলিলেন, "নেকী !—মুখে মুখে চোপা ! শিলনোড়া দিয়ে থোতা মুখ ভোঁতা করে' দেব।"

অদিতি ঘরের ভিতর হইতে সমস্ত বিছানা, বালিশ, কাপড়, বাক্স প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া বাহিরে আনিয়া রাখিল। শাশুড়ী

আবার কহিলেন, "এইবার ওর মাথার বালিশটা নিয়ে এস মেজ-বউ, ওর বিছানাগুলো ত আর এখন আনা যাবে না,—সে না হয় ও উঠ্‌লে পরে এক সময় লুকিয়ে-লুকিয়ে হ'বে!"

অদিতি ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া, নিদ্রিত শ্বশুরের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল;—দ্বারের কাছ হইতে ক্রমাগত হস্তেঙ্গিতে শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণী কিন্তু তাহাকে শীঘ্র কাজ হাসিল করিবার জন্য তাড়া দিতে লাগিলেন, এবং অস্ফুট-স্বরে যে সকল উক্তি করিতে লাগিলেন, তাহাতেও অদিতির আনন্দিত হইবার মতন বিশেষ কিছু বোধ হয় ছিল না।

কোন প্রকারে সাহসে বুক বাঁধিয়া অদিতি অগ্রসর হইল, বালিশের একটা কোণ ধরিয়া আস্তে আস্তে টান দিতেই পরিতোষের নাসিকাধ্বনি বন্ধ হইয়া গেল, দুই হাত দিয়া বালিশটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিদ্রাবিজড়িত স্বরে মুদিতনেত্রেই তিনি কহিলেন, "কে?"

ভয়ে অদিতির হৃৎস্পন্দন থামিয়া গেল,—অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে আসিয়া যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইল। কহিল, "পারলাম না মা,—উনি টের পেয়ে গেলেন।"

নয়নতারা বিচিত্র মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "কাঁড়ি কাঁড়ি গিল্‌বার বেলা ত পার বাছা, আর একটা কাজের কথা বল্‌লেই কি গতরে আগুন লেগে যায়!" বলিয়া, একটু থামিয়া কহিলেন, "একটা সেফ্‌টিপিন দাও দিকিনি, দেখি আমিই যদি আন্‌তে পারি।"

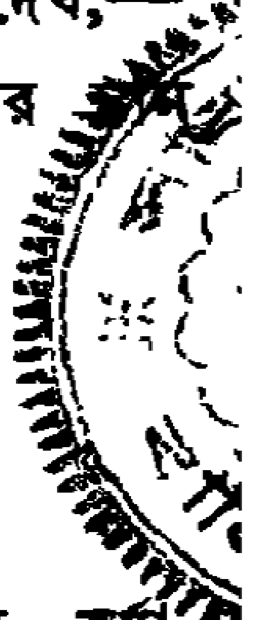
হাতের শাঁখাটাতে গোটা তিন-চার সেফ্‌টিপিন প্রায়ই আঁটা থাকে,—নিজের ছেলেমেয়েগুলার পোষাকপরিচ্ছদের হাঙ্গামা বড় বেশী নাই, এবং কখন-সখন যেসব ফুটা-ছেঁড়া কোনও ফ্রক্, ইজের-বডি অথবা পেনি পরান হয়, সেগুলারও বোতামের সন্ধান কদাচিৎ মেলে, অতএব সেফ্‌টিপিনের রসদ অদিতি হাতের কাছেই সংগ্রহ করিয়া রাখে। তাহারই ভিতর হইতে একটা খুলিয়া লইয়া শাশুড়ীর হাতে দিল।

নয়নতারা ঘরে ঢুকিয়া বাঁ-হাতে বালিশের একটা কোণ ধরিয়া সজোরে টান দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ডান-হাতের সেফ্‌টিপিনটা দিয়া বালিশের কোণ খানিকটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া যেন কতকটা নিজের মনেই বলিলেন, "ইস্, বালিশ ফেটে একেবারে তুলো বেরিয়ে গেছে! যাই এটাকে এইবেলা সেলাই করে' রাখিগে, যেদিকে নিজে না দেখ্‌ব—"

হঠাৎ মাথার বালিশ টানিয়া লওয়াতে পরিতোষের ঘুম চটিয়া গিয়াছিল, এবং মাথাটা বিছানার উপরে অতর্কিত ভাবে পড়ার জন্য তিনি কতকটা বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতেই নয়নতারার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কিন্তু কোন প্রকারে বালিশটাকে বগলদাবা করিয়া নিজের মনে বকিতে বকিতে বাহির হইয়া আসিতে পারিলেই নয়নতারা তখনকার মতন বাঁচিয়া যান, অতএব তিনি আর পরিতোষের দিকে ফিরিয়া তাকানোর প্রয়োজন অনুভব করিলেন না।

বাহিরে আসিয়া বালিশটা অদিতির দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া

রুষ্টমুখে তিনি কহিলেন, "নাও গো মহারাণী, এবার এটাকে দয়া করে' সেলাই করে', ধুয়ে দিতে পার কি না একবার দেখ,— এই ছিষ্টি আমায় দিয়ে ছোঁয়ালে ত,— আর একবার স্নান করতে হবে, এই যা হ'ল লাভের মধ্যে।"



এক পুত্র, তিন কন্যা;—পুত্রটি বড়। দশটি গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্তের প্লীহালিভার-পরিপূর্ণ চেহারা। কন্যা তিনটি আট, ছয় এবং চার বৎসরের পৃথিবীর আশীর্ব্বাদ পাইয়াছে,— রোগা সরু আকৃতি, কাঠি কাঠি হাত-পা, ঢাকাই জালার মতন পেটগুলা নানাবিধ অখাদ্য, কুখাদ্য এবং কুপথ্যে দিবারাত্র পূর্ণ।

বড়-মা অনঙ্গমোহিনী নিজের এবং দেবরের পুত্রকন্যাগুলিকে এক জায়গায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া, বেলা দুইটার সময়ে এক ধামা মুড়ি খাওয়াইতেছিলেন। মুড়িগুলা দেখিতে দেখিতে উবিয়া গেল!—ওই শীর্ণ-বিশীর্ণাকৃতি শিশুগুলার শরীরের কোন্ স্থানে যে অতগুলা জিনিষ কেমন করিয়া স্থান পাইল, সে কথা মনে করিলেও বিস্মিত হইতে হয়!

অনঙ্গমোহিনী অদিতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "মেজ-বউ, সকালের ভাত-ডাল কি কিছু আছে?"

অদিতি কহিল, "আছে।"

"নিয়ে এস ত, ওদের এইবেলা খাইয়ে দিই।"

অদিতি এক গাম্‌লা ভাত আনিয়া কাছে রাখিল। মিনিট দু' তিন পরে ডালের বাটিটা হাতে লইয়া আসিয়া দেখিল, এক গাম্‌লা ভাতের একটাও অবশিষ্ট নাই! বড়-মা মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "তোমার সব কাজেই বাপু আঠারো মাসে বচ্ছর—ক্ষিধের সময় বাছারা কতক্ষণ তোমার ডালের জন্যে পিত্যেশ করে' বসে' থাক্‌তে পারে?"

অদিতি ফিরিতেছিল, অনঙ্গমোহিনী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—"ডালটা ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ যে বড়? তোমার রাগ দেখাবার জন্যে ওটা নিয়ে আসতে বলেছিলাম নাকি?—আক্কেলকেও বলিহারি যাই বাপু!"

অদিতি বাটি রাখিয়া দিল। তাহারই পুত্র শ্রীমান অনুতোষ সেটা ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া বিপুল শব্দে চুমুক দিতে আরম্ভ করিল, অন্যান্য ছেলেমেয়েগুলা সুউচ্চ কলরবে সমস্বরে কহিতে লাগিল, "আমাকে, আমাকে—"

সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জোড়া হাত একই সময়ে ডালের বাটির চারিদিক শক্ত করিয়া ধরিয়া ফেলিল। অনঙ্গমোহিনী একপাশ দিয়া হাত বাড়াইয়া অনুতোষের ভোজনে বাধা দিয়া কহিলেন, "সবটা খাস্‌নে যেন, ওদেরও একটু দিস্—"

—রাশীকৃত বাসন পড়িয়া আছে সেগুলা মাজিতে হইবে,—বিছানা, বালিশ, লেপ, তোষক, বাক্স, মাদুর প্রভৃতি ধোয়া বাকী—অদিতি দ্রুতপদে কলতলায় চলিয়া গেল।—রান্নাঘরের

বারান্দায় একটা পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া নয়নতারা তাহার কার্য্যের তদারক করিতে লাগিলেন।

—"শাঁখাটা একটু তুলে নাও মেজ-বউ,—কাপড়ের আঁচল কোমরে জড়িয়ে নিলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যায়? —দেখি নিয়ে এস দিকিনি কড়াইটা, কেমন মাজা হ'ল,—ঘুরিয়ে ধর—দেখি ওপাশটা, এসব দাগ কিসের? চোখের মাথা কি খেয়েছ?—ফের ধুগে যাও। এই যাঃ! ঝাঁটাগাছটা ছুঁলে বুঝি?"—বলিয়া নয়নতারা অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, —"চোকখাকী, দেমাকের চোটে কিছু দেখতে পাও না, না? আজ আবার তোকে দিয়ে সমস্ত বাসন মাজাব তবে আমার নাম নয়নতারা! দেখি তুই কত বড় বদ্‌মাইস্!—এসব ইচ্ছে করে' নয়?—এসব আমাকে জব্দ করা নয়?"

অদিতি ঝাঁটাটার পানে চাহিল—দেওয়ালের গায়ে নিরীহভাবে দাঁড় করান আছে; কেমন করিয়া যে সেটাকে সে ছুঁইতে পারে তাহা অদিতি বুঝিতে পারিল না। অত্যন্ত কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, "আমি ত ওটা ছুঁইনি মা—"

"ফের চোপা! ওর ছায়াটা কোথায় পড়েছে একবার চোখ খুলে দেখ গো বাদ্‌শাজাদী,—আমরা সব মুখ্যু, কিছু ত আর বুঝিনে,—ওই ছায়াটার ওপর দিয়ে তুমি যাওনি?—আমি মিথ্যেবাদী!—"

অদিতি কথা কহিল না,—স্তূপীকৃত বাসনের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত ভরসা যেন নিঃশেষ হইয়া গেল!—এইগুলা

আবার মাজিতে হইবে,—কতবারের বিপদ অতিক্রম করিয়া ইহাদের ঘরে তোলা যাইবে, তাহা আন্দাজ করিতে পারা যায় না।

সমস্ত ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচাইয়া, হাজার রকমের গালাগালি এবং পিতৃপুরুষদিগের অজস্র নিন্দাবাদ নিঃশব্দে হজম করিয়া অদিতি বাসন-মাজা-পর্ব্ব শেষ করিল।

নয়নতারা কহিলেন, "এইবার চান্ করে' নাও মেজ-বউ, তারপর বিছ্নাগুলো কাচো।"

বিছানা কাচিবার সময় আবার তদারক চলিল।—

"আস্তে আস্তে আছ্ড়ো বাপু, পরের জিনিষ বলে' কি অম্নি করেই কাচ্তে হয়?—মেয়েমানুষের অত জোর ভাল নয়,—দিন দিন খাচ্ছ আর হাতিটি হ'চ্ছ—"

অদিতি নিজের রিক্ত শীর্ণ হাত দুইটার পানে চাহিয়া ম্লান হাসিল।

"দেয়ালের গায়ে ছিটকে গেল জলগুলো, চৌবাচ্চার গায়েও লেগেছে,—কলের জল দিয়ে কলের মাথাটা ধুয়ে দিয়ো, একটু গঙ্গাজল বার করে' দেব'খন, কলের ওপরে ছিটিয়ে দিয়ো,—দেয়ালগুলো ধুয়ে ফেলো মেজ-বউ, চৌবাচ্চার জল ছেড়ে দিয়ো,—চৌবাচ্চার বাইরেটায় জল দিতে ভুলো না যেন—"

জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলা আসিয়া কহিল, "মা, ছেলেমেয়েগুলোর খিদে পেয়েছে, দাওনা গোটাকতক পয়সা, পকৌড়ি ডেকে যাচ্ছে, কিনে দিই—"

কন্যার কানের নিকট মুখ লইয়া গিয়া, কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নীচু করিয়া নয়নতারা কহিলেন, "তোর বাপের পকেট থেকে চার আনা পয়সা বা'র করে' নিগে যা সুশী,—তার থেকে চার্টে পয়সা কিন্তু আমার, আমায় দিয়ে যাস্ বাছা,—আর তিন আনার পকৌড়ি কিন্‌গে যা।—"

সুশীলা অগ্রসর হইতেই, তাহাকে ডাকিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্বরে কহিলেন, "দুটি পকৌড়ি আমায় দিয়ে যাস্ সুশী,—অরুচির মুখে বেশ গরম গরম চিবুব'খন—"

তেরোটা বৎসর এই গৃহে কাটিয়াছে,—অদিতি ভাবে, "এক-আধটা মাস নহে, একটা দুইটা বৎসর নহে,—কেমন্ করিয়া কাটাইলাম?—বাপ-মা, ভাই-বোনদের চেহারা অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে,—ষোল বছর বয়সে আসিয়াছিলাম, আজ ঊনত্রিশ বছর বয়স হইল,—বুড়া হইব আর কতদিন পরে?—আজ যদি এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখ তুলিয়া দাঁড়াই, তাহা হইলে লোকে হাসিবে, বলিবে, এতগুলা বছর পরে আজ হঠাৎ ঢং করিতে বসিয়াছি। কিন্তু বয়স যে আমার হইয়াছে তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি না। কালো মাথায় হয়ত আর কয়েকটা বছর পরেই সাদায় ছোপ লাগিবে, কিন্তু তবুও ত মনে হয় না

আমার শৈশবের মন, আমার বাপ-মা, ভাই বোনের গৃহকোণকে অতিক্রম করিয়া আসিলাম—”

হঠাৎ তাহার শ্বশুর মহাশয়ের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তাঁহার পকেট হইতে চার আনা পয়সা হারাইয়াছে, তাহারই জন্য তিনি ঘুম থেকে উঠিয়াই চীৎকার করিতেছেন!

অদিতি শুনিল তাহার শাশুড়ী বলিতেছেন,—তুমি ঘুমোবার পর আমরা বাপু কেউ ও-ঘরে আর যাইনি,—কেবল মেজ-বউ দু' একবার গিয়েছিল, তাকেই না হয় ডেকে জিজ্ঞাসা কর—”

কথাটার ভিতরকার ইঙ্গিত অদিতিকে যেন একেবারে স্তব্ধ করিয়া দিল, আর কিছু শুনিবার সাহসও তাহার রহিল না। রান্নাঘরে ফিরিয়া গিয়া ডালে কাঠি দিতে দিতে সে ভাবে, ইহাদের কাছ হইতে কি কি পাওনা আর আমার বাকী রহিল?

কয়েকদিন ধরিয়া চিন্তা করিবার পর অদিতি সেদিন স্থির করিয়া ফেলিল যে, তাহার কপালে যাহাই ঘটুক না কেন, সে তাহার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার নিজের হাতেই গ্রহণ করিবে।

পুত্র অশুতোষের বয়স হইয়াছে দশ, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সে প্রথম ভাগের গণ্ডী পার হইতে পারে নাই।—এক, দুই হইতে

আরম্ভ করিয়া একশ' পর্য্যন্ত গণিয়া যাওয়াটাকে সে অনাবশ্যক পরিশ্রম বলিয়া মনে করে,—সেইজন্যই অদ্যাবধি সে-কাজে হাত দেয় নাই।

অদিতি তাহাকে দুই-একদিন লইয়া বসিয়া পড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার ফলে যে গণ্ডগোলটা বাধিয়া উঠিয়াছিল, মোকদ্দমায় সর্ব্বস্ব হারিয়া অবশেষে হঠাৎ একদিন বিজয়ী পাওনাদারকে নিজের এলাকার মধ্যে পাইলেও বোধ হয় তেমনটি হয় না।

কেন জানি না, তিপ্পান্ন সংখ্যাটির উপরে অনুতোষের বিশেষ অনুরাগ দেখা যাইত।—সেদিন অদিতি নিজে এক হইতে দশ পর্য্যন্ত গণিয়া ছেলেকে বলিল, "এইবার তুই বলে' যা—"

অনুতোষ কহিল, "এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়—তিপ্পান্ন—"

সংশোধন করিয়া দিয়া অদিতি কহিল, "তিপ্পান্ন নয়,—সাত, আট, নয়, দশ—"

অনুতোষ দরজার দিকে আড়চোখে চাহিয়া দেখিল তাহার উদ্ধারকর্ত্রীদিগের মধ্যে কেহ আসিতেছে কি না। কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "সাত, আট, নয়, দশ, তিপ্পান্ন—"

অদিতি আবার শোধরাইয়া দিয়া মিষ্টস্বরে কহিল, "তিপ্পান্ন নয় অনু,—বল এগারো, বারো, তেরো, চোদ্দ, পনেরো—বল আমার সঙ্গে সঙ্গে—"

অম্বুতোষ অধিকতর ক্লিষ্টকণ্ঠে কহিল, "এগারো, বারো, তেরো,—তিপ্পান্ন—"

অদিতি অসন্তুষ্ট হইল, ঈষৎ বিরক্তভাবে কহিল, "কেবল তিপ্পান্ন তিপ্পান্ন কোরো না অম্বু,—আমি যা বল্‌ছি তাই বল—"

সুস্পষ্ট বিদ্রোহের সুরে অম্বুতোষ ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল, "বাঃ রে, তিপ্পান্ন আস্‌বে না বুঝি ?"

"আস্‌বে, তার এখনও দেরী আছে,—আগে পঞ্চাশ পর্য্যন্ত গণ্‌তে শেখো, তারপর একান্ন, বাহান্ন, শেষে হ'বে তিপ্পান্ন—"

দরজার কাছে ছোট ননদ সুনীলা আসিয়া দাঁড়াইল। বুদ্ধিমান অম্বুতোষ পিসিকে দেখিয়াই "ভঁ্যা" করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সুনীলা মেয়েটির বয়স বেশী নয়, কিন্তু মাতার নাম সে রাখিতে পারে এমনি জিভের ধার। সে কহিল, "কি গো মাষ্টারণী, ছেলে-ঠেঙানো পাঠ চলছে বুঝি!—ও মা, দেখে যাও তোমার আদরের মেজ-বউয়ের কীর্ত্তি!—হ্যাঁরে অম্বু, কি হয়েছে রে ?"

নির্ভয়ে অম্বুতোষ কহিল, "মা মেরেছে।"

মেয়ের ডাকে নয়নতারা ঘরের দরজার কাছে আসিয়া কহিলেন, "এ বাড়ীর কোন ছেলেমেয়ের গায়ে হাত তুলবার আগে বেশ ভালো করে' বিবেচনা করে' তুলো মেজ-বউ—হাতখানা ভেঙে দিতে ত বেশী সময় লাগ্‌বে না বাছা,—আর তা ছাড়া ছেলেরা আমাদের লেখাপড়া শিখুক আর না-ই শিখুক, ওদের বাপ-ঠাকুর্দ্দা, জ্যেঠা-খুড়োরা বেঁচে থাক্‌তে ওদের কোনও

নিগ্রহ আমি সইতে পারব না, এ আমি তোমাকে বলে' দিচ্ছি।" বলিয়া তিনি এবং সুনীলা উভয়ে অনুতোষকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু অদিতি তবুও ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না।—

ইহার কয়েকদিন পরে সন্ধ্যাবেলায় উনানের উপর ভাতের হাঁড়ি চাপাইয়া রান্নাঘরের হারিকেন্‌টা হাতে করিয়া, অদিতি প্রথম ভাগখানা সংগ্রহ করিয়া লইল। কাপড়ের তলায় বইটাকে লুকাইয়া লইয়া অনুতোষকে কাছে ডাকিয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "আমার সঙ্গে ছাদে যাবি অনু? তোর জন্যে দুপুর বেলা লজেঞ্জ্‌স্ কিনে রেখেছিলাম, চল্ ছাদে গিয়ে তোকে দিই,—এখানে বা'র করলে অন্য সবাই চাইবে কিনা,—যাবি বাবা?—একটা গল্পও বল্‌ব'খন।"

নিজের ছেলের সহিত এই প্রবঞ্চনায়, এবং মিথ্যাচ্ছলেও সকলকে বঞ্চিত করিয়া একজনকে কিছু দেওয়ার কথা উচ্চারণ করিবার গ্লানিতে অদিতির সত্যসন্ধ মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল,- কিন্তু উপায় নাই, ইহাদের হাত হইতে নিজের সন্তানকে রক্ষা করিতে হইলে এই অসত্যের আশ্রয় না লইয়া কোনও উপায় নাই।

অনুতোষ কহিল, "কই আগে লেবেঞ্চুস্ দেখাও।"

কাপড়ের ভিতর হইতে একটা ঠোঙা বাহির করিয়া অদিতি লজেঞ্জ্‌স দেখাইল, অনুতোষ তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া কহিল, "চল—"

মাতাপুত্রে নিঃশব্দপদে সিঁড়ি বাহিয়া ছাদে উঠিয়া গেল। শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, যা, ননদ এবং অন্যান্য ছেলেমেয়েগুলা তখন বিপুল কলরবে ঘরের ভিতরে সান্ধ্যবৈঠক বসাইয়াছে; শীঘ্র কাহারও ছাদে আসিবার সম্ভাবনা ছিল না।

অদিতি পুত্রকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া প্রথম-ভাগখানা বাহির করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "তুই যদি রোজ আমার কাছে একটু একটু পড়িস্ অমু, তাহ'লে তুই যা চাইবি তাই দেব—ঘুড়ি, লাটাই, লাট্টু, গুলি সব পাবি,—কেমন পড়্বি ত?"

ক্রুদ্ধ অমুতোষ কহিল, "এই বুঝি তোমার লেবেঞ্চুস্?—আমি যাচ্ছি এখুনি ঠাকুমা'কে বলে' দিতে।"

কাপড়ের ভিতর হইতে একটা কাঠ বাহির করিয়া অদিতি অকরুণভাবে বলিল, "আজ তোমাকে পড়্তেই হবে, নইলে এই কাঠ আমি তোমার পিঠে ভাঙ্‌ব,—দশদিন আগে তোমাকে পড়া দিয়েছিলাম, সে পড়া আজ আমার চাই-ই।"

নিরীহ মায়ের এ মূর্ত্তি অমুতোষের কাছে সম্পূর্ণ নূতন!—বিহ্বলভাবে সে শুধু কহিল, "কিন্তু, লেবেঞ্চুস্?—"

"দেব পড়া হ'য়ে গেলে পর—"

প্রথম ভাগের একখানা পাতা খুলিয়া অদিতি বলিল, "'জল' বানান কর ত।"

অমুতোষ চুপ করিয়া রহিল।

ছেলেকে ভরসা দিয়া অদিতি কহিল, "ভুল হ'ক, ভয় কি?

তুমি বল্‌তে চেষ্টা কর অনু,—আমি বকব না, মারব না, কিচ্ছু বল্‌ব না।"

অনুতোষ তথাপি কোন শব্দ করিল না।

অদিতি কহিল, "বল জ—"

দম-দেওয়া গ্রামোফোনের মতন অনুতোষের গলা হইতে বাহির হইল, "জ—"

"হ্যাঁ, তারপর বলে' যাও,—বল 'জল' বানান, লক্ষ্মী ছেলে বল, অমন চুপ করে' থাকে কি ?"

কিন্তু নীরব অনুতোষের অটল নীরবতা ভঙ্গ হইল না।

অদিতি আবার বলিল, "জ আর ল, জল—"

অনুতোষ এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল, "জ আর ল, জল—

"কোন্ জ বল ত।"

অনুতোষ আবার মূক হইয়া গেল।

অদিতি এবার জিজ্ঞাসা করিল, " 'পড়ে' বানান কর ত।"

অনুতোষের নিকট হইতে সাড়া পাওয়া গেল না। অদিতি বিরক্ত হইয়া বলিল, "প—"

অনুতোষ কহিল, "প—"

"তারপর ?"

অনুতোষ আর কথা কহিল না।

অদিতি তাহাকে সাহায্য করিয়া বলিল, "ড়-য়ে একারে ড়ে, পড়ে—"

"ড়-য়ে একারে ড়ে, পড়ে।"

"কোন্ ড় বল ত।"

অনুতোষ নীরব!—অসন্তুষ্টভাবে অদিতি কহিল, "জবাব দাও অনু! 'পড়ে' লিখ্‌তে কোন্ ড় লাগে? বল, চুপ করে' থেকো না।"

কেন বলিতে পারি না, হঠাৎ অনুতোষের সুবুদ্ধির উদয় হইল, কহিল, "মধ্যাহ্ন র—"

বিস্মিত হইয়া অদিতি কহিল, "কোন্ ড় বল্‌লে?"

"মধ্যাহ্ন র—"

"মূর্দ্ধণ্য র?—সে আবার কি?"

হতাশভাবে বইখানা পাশে রাখিয়া দিয়া অদিতি ভাবিতে লাগিল। 'মূর্দ্ধন্য র' জিনিষটা যেমন নূতন তেমনি অশ্রুত-পূর্ব্ব, দস্তুরমতন ভাষাতত্ত্বের গবেষণা!

সিঁড়ির মাথায় কাহার মূর্ত্তি দেখা দিতেই অদিতি সচেতন হইয়া উঠিয়া বইটা কাপড়ের তলায় লুকাইয়া ফেলিয়া কহিল, "গল্পটা শোন অনু,—দুর্ভিক্ষে তখন শ্রাবস্তী নগর ছেয়ে গেছে—" বলিতে বলিতে তাহার সমস্তটা মন নিজের প্রতি ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া গেল। মনে হইল, কেন এই লুকোচুরি, এত ভয়ই বা কিসের জন্য?—ইহাদের প্রশ্রয় ত এতগুলা বছর ধরিয়াই দিয়া আসিল, ফল ত কিছুই হইল না, এখন একটু ভিন্ন সুরের সঙ্গীতই না হয় চলুক না। এই যে অসত্য, এই যে মিথ্যা আচরণ তাহাকে ছেলের সাম্‌নে করিতে হইতেছে, ইহাতে ত ইহাদের কাছে এই কথাই স্বীকার করা হইতেছে, তোমাদের অন্যায়ের কাছে হার

মানিয়াছি। নিজের সন্তানের সম্মুখে এই যে অপমান‚ সে নিজেই নিজেকে করিয়া বসিল, ইহার পরে কি নিজের মনের তৃপ্তিটুকুও তাহার অবশিষ্ট থাকিবে ?

সিঁড়ির দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া, প্রথমভাগখানা পুনরায় বাহির করিয়া সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্নকণ্ঠে অদিতি কহিল, ' শোন অমু, এই মাস শেষ হ'তে আর আট দিন বাকী আছে, এই আট দিনের ভিতরে তোমাকে প্রথম ভাগ শেষ করতে হবে, এটা মনে থাকে যেন,—আজ কম করে' পড়া দিচ্ছি, এটা আমার কালকে চাই,—কাল থেকে তারপর বেশী বেশী করে' পড়া দেব।"

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া বড়-মা অনঙ্গমোহিনী একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে এ সংসারে বেমানান হয় নাই,—এই বাড়ীর লোকগুলার সকল গুণই তাঁহাতে ছিল, এবং তাঁহার বিবাহের পর প্রথম প্রথম যখন তাঁহার শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে তুইটা কথা শুনাইতেন, তখন তদুত্তরে অনঙ্গমোহিনী গণিয়া গণিয়া নয়নতারাকে দশটা কথা বলিতেন, আর এমন করিয়া বলিতেন যে নয়নতারা তাঁহাকে আর দ্বিতীয়বার ঘাঁটাইতে সাহস করিতেন না।

অদিতির জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তোলার কাজে অনঙ্গমোহিনীর একটা বড় অংশ ছিল।—আজ অপ্রত্যাশিতভাবে এই অতিসহিষ্ণু মেয়েটির কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের স্বর শুনিয়া তিনি যেন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। নিরীহ শান্ত মেষশাবকটি নিঃশব্দে পড়িয়া মার খাইতে খাইতে অকস্মাৎ যদি ঘাড় ফিরাইয়া ঘুরিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে

আশ্চর্য্য এবং বিরক্ত হয় না এমন প্রহারকর্ত্তা বোধ হয় বিরল !

অনঙ্গমোহিনীও বিস্মিত হইলেন, কহিলেন, "কিগো অম্বুতোষের মা-জননী, তোমার ছেলের ওপর আমাদের দাবী-দাওয়া আজ থেকে চুকল নাকি ?—তা বেশ ভালোই মেজ-বউ, আমাদের কাছে থাকলে ছেলে তোমার বিগড়ে যাবে বাপু, নিজেই লালনপালন কোরো,—নিজের পাঁঠা যখন, তখন ল্যাজের দিক দিয়ে কাটাই ভালো।" বলিয়া নীচে চলিয়া গেলেন।

অম্বুতোষ একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া জ্যেঠাইমার পিছনে পিছনে নামিয়া গেল।—অদিতি শঙ্কিত হইল, বুঝিল হঠাৎ এতটা সাহস দেখান ভালো হয় নাই। আজ যে অদৃষ্টে কি ঘটিবে সেই কথা ভাবিতে ভাবিতেই সে পুনরায় রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অনঙ্গমোহিনী হাসিয়া বলিলেন, "ওগো মা, তোমাদের বাছুরের শিঙ্ গজিয়েছে গো, আজকাল মাথা নাড়ে।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে বড় ননদ সুশীলার গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন।

একপাল ক্ষুধার্ত্ত নেকড়েবাঘের সম্মুখে এক টুকরা মাংস ফেলিয়া দিলে যেমন হয়, তেমনিতর একটা নূতন মুখরোচক কিছুর সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনায় ঘরসুদ্ধ সমস্ত লোকগুলা যেন হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল।

নয়নতারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে গা, বড়-বউ ?"

অনঙ্গমোহিনী কহিলেন, "তোমার মাষ্টারণী মেজ-বউ যে তার ছেলেমেয়ের ভার নিজের হাতে নিতে চাইছে গো,— আমরা মুখ্যু, গেঁয়ো চাষা, ছেলেপুলে মানুষ কর্‌তে আমরা জানিনে, একথা ত আমার মুখের ওপরেই আজ বলে' দিলে—"

পশ্চাৎ হইতে অনুতোষ ফোড়ন দিয়া বলিল, "আমি পের্‌থম ভাগ না পড়্‌লে মা বলেছে, আমার হাড় ভেঙে দেবে ঠাকুমা,— আর তোমাকে বলেছে দজ্জাল, বজ্জাৎ,—আমায় শিখিয়ে দিয়েছে, ঠাক্‌মা'র কাছে খবরদার যাস্‌নি—"

শুক্‌না খড়ের গাদায় যেন আগুন পড়িল। শ্বশুর, শাশুড়ী, যা, ননদেরা, এবং ছেলেমেয়েগুলা মিলিয়া যে-রকম চীৎকার এবং অসংযত ভাষায় গালাগালি আরম্ভ করিল, তাহা শুনিয়া রান্না-ঘরে বসিয়া অদিতি কানে আঙুল দিয়া লজ্জায় এবং ঘৃণায় মাটির সহিত মিশিয়া গেল।

নয়নতারা দুই কন্যাকে সঙ্গে লইয়া অদিতিকে রান্নাঘর হইতে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া বাহির করিলেন, পাশের ঘরে লইয়া গিয়া গর্জ্জাইতে গর্জ্জাইতে কহিলেন, "সুশী, খানিকটা সর্ষের তেল গরম করে' নিয়ে আয় ত,—অনুতোষ, চেলাকাঠ একটা আন্‌ দিকিনি—" বলিয়া একখানা কাপড় দিয়া হাত-পা বাঁধিয়া অদিতিকে মাটিতে ফেলিয়া রাখিলেন।

নিমেষমাত্র অদিতির দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া অনুতোষ ঘুরিয়া দাঁড়াইল,—হাত দুইটা মুঠা করিয়া কি যেন একটা

ভাবিয়া লইয়া অকস্মাৎ নয়নতারার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল,—পাগলের মতন কিল, চড় বর্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "হারামজাদী রাক্কুসী, আন্‌ছি চেলাকাঠ,—হারামজাদী পেত্নী,—তোর পিঠে ভাঙ্‌ব চেলাকাঠ—"

স্তম্ভিত নয়নতারা আত্মরক্ষা করিবারও অবকাশ পাইলেন না! সুশীলা, সুনীলা এবং অনঙ্গমোহিনী জোর করিয়া অন্নুতোষের হাত-পা ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া লইয়া চলিলেন।—অন্নুতোষ চীৎকার করিয়া তাহাদের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নয়নতারা গালাগালির চোটে কড়ি-বরগা ফাটাইতে লাগিলেন।

পাশের ঘরে অন্নুতোষকে বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দেওয়া হইল। তাহার নিষ্ফল ক্রন্দন, নিষ্ফলতর আস্ফালনের শব্দ অদিতির কানে আসে,—পাশের ঘরের রুদ্ধ-দ্বারের উপরে পদাঘাতে অতি পুরাতন বাড়ীটার এই ঘরের জীর্ণ দরজাটা অবধি যেন ঝন্ ঝন্ করিতেছে!

নয়নতারা কহিলেন, "হারামজাদা খুনে—"

গরম তেল আসিল, চেলাকাঠ আসিল,—দাঁতে দাঁত চাপিয়া অদিতি পড়িয়া রহিল, চোখ দিয়া একফোঁটা জলও বাহির হইল না।

ও-ঘর হইতে অন্নুতোষের কান্নার শব্দ অদিতির কানে ভাসিয়া আসে,—"আমার মা'কে ওরা মেরে ফেল্‌ল গো!"

অদিতির বুকের ভিতরে বসিয়া অন্নুতোষের জননী কহিলেন, "হায় অভাগা!"

কাঠটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সুশীলা কহিল, "কি শক্ত হাড় বাবা, আমার হাতে ফোস্কা পড়ে' গেল, তবু ত হারামজাদীর চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল বেরোল না!"

হাত-পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে নয়নতারা কহিলেন, "বেড়ালের প্রাণ!—আসুক আজ বিশে,—ও কত বড় শয়তান, আমি একবার দেখ্‌ব।"

হাত, পিঠ, কপালের রক্তগুলা ধুইতে ধুইতে অদিতি হাসিল, নিজের মনেই কহিল, শৈশবে মাতার কাছে শিবপূজা করিতে শিখিয়াছিলাম,—ভবিষ্যৎ শ্বশুরবংশের কল্যাণের জন্য, শাশুড়ী ননদ, যা, দেবর প্রভৃতির জন্য কত প্রার্থনাই না করিয়াছি,—সকলই সার্থক হইয়াছে! মায়ের কাছে বধূর কর্ত্তব্য, গৃহিণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কত উপদেশই না পাইয়াছিলাম, সে সকলও কাজে লাগাইতেছি! বাবার নিকট হইতে সন্তানপালন সম্বন্ধে কত কথাই না শুনিয়াছি, কত দৃষ্টান্তই না দেখিয়াছি, সকলই সফল হইয়াছে!

মাথায় জলপটি বাঁধিয়া অদিতি আবার আসিয়া রান্না করিতে বসিল। মনে মনে ভাবিল, ইহাদের পাশবশক্তি তাহাকে কতখানি আঘাত করিতে পারে? ইহাদের রুচি, ইহাদের ভাষা ইহাদের কুৎসিত আচরণ, ইহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী এই সকল

তাহাকে যত ব্যথা দিল, গায়ের ফোস্কা শরীরের রক্ত তাহার কাছে কিছুই নয়!

যে পবিত্রতার ভিতর হইতে সে তাহার শুচিশুভ্র মন, কুমারী-হৃদয়ের ভক্তি ভালবাসা লইয়া আসিয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়া গেছে। দেবপূজার জন্য তাহার সমস্ত আয়োজন কুকুরের উচ্ছিষ্টে পরিণত হইয়াছে! তাহার প্রথম প্রভাতের শুভ্র জীবন,—এ জন্মে তাহাতে ফিরিয়া যাইবার কোন পথই আর খোলা নাই!—এতক্ষণ পরে অদিতির চোখে জল দেখা দিল। জীবনের ভাগ্যপরীক্ষায় সে ঠকিয়াছে, মাণিকের সন্ধানে বাহির হইয়া, সে মাটির ঘড়া লইয়া ঘরে ফিরিয়াছে। তেরো বৎসরের স্বামীগৃহবাসের অনেক পুরস্কারের চিহ্নই ত সর্ব্ব অঙ্গে আঁকা আছে,—চিতার আগুণে এই দেহটা যেদিন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, ওই দাগও মিলাইবে সেই দিন। কিন্তু সে সকলের জন্য অদিতি সর্ব্বান্তঃকরণে এই পশুধর্ম্মী মানবগুলাকে ক্ষমা করিতে পারে। কিন্তু তাহার সেই মন, সেই হৃদয়, যাহার প্রসারকে ইহারা বাধা দিল, প্রতি কার্য্যে প্রতি আচরণে প্রতি পলে পরিপূর্ণ অপমান যাহারা সেই হৃদয়টিকে করিল, সে অসম্মানের ডালি যাহারা অগ্রসর করিয়া দিল, তাহাদের সেই অপরাধ ক্ষমা করিবার কথা যেন সে মনেও আনিতে পারে না! তাহার অন্তরস্থ ক্রন্দন জাগিয়া রহিল,—গায়ের ব্যথা, প্রহারের দুঃখ তাহার তুলনায় ম্লান হইয়া গেল।

—দেবর ভবতোষ রান্নাঘরের মধ্যে আসিয়া কহিল, "বৌদিদি

আজকাল রাঁধ্‌তে বড্ডই পরিশ্রম হয় বলে' মনে হচ্ছে,—পষ্ট করে' বল্‌লে তোমারও কষ্ট বাঁচে আমাদেরও সুবিধে হয়!" একটু থামিয়া বলিল, "বৌদির চেহারা দিন দিন বেশ পাকিয়ে উঠ্‌ছে,—যেন শেওড়াতলার শাঁকচুন্নী!" বলিয়া সে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। বোধ হয় ভাবিল, রসিকতা খুব জোরাল হইয়াছে!

পূর্ণ দৃষ্টিতে ভবতোষের পানে চাহিয়া অদিতি কহিল, "আপনাদের ঘরের বউ হ'য়ে যখন এসেছি, তখন আপনাদের গৌরবের যাতে বিন্দুমাত্রও হানি না হয়, সেদিকে আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাক্‌বে!"

শ্লেষটা ভবতোষের নিরেট মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না,—কিন্তু একটা কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করিয়া সে কহিল, "তা বটেই ত, তা বটেই ত"—বলিতে বলিতে সে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রিতে বিশ্বতোষ বাড়ী ফিরিলে নয়নতারা কহিলেন, "তোর বউয়ের মুখে খ্যাংরা মেরে বাড়ী থেকে যদি না আজ দূর করিস্ বিশে, তাহ'লে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব।"

বিশ্বতোষ কহিল, "হারামজাদী ফের্ তোমায় গাল দিয়েছে বুঝি?"

নয়নতারা বলিলেন, "গাল ?—শুধু গাল দিয়েছে বুঝি ? কেবল মারতে বাকী রেখেছে !—বিশ্বাস না হয় বরং জিজ্ঞেস্ কর্ তোর ছেলেকে—"

বিশ্বতোষের আর শুনিবার প্রয়োজন হইল না, ছুটিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।

সকলের খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেছে, পতিদেবতার ভাত একপাশে ঢাকা দিয়া রাখিয়া, বহুকাল পরে অদিতি পিতাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছিল,—স্বামীর সাড়া পাওয়ামাত্র দোয়াত, কলম, কাগজ একটা বাটির তলায় লুকাইয়া ফেলিল,—বিশ্বতোষ ঘরে ঢুকিতেই তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কাঠখানা এনে দিই, নইলে তোমার হাতে ব্যথা লাগতে পারে, কি বল ?—"

লাফাইয়া গিয়া বিশ্বতোষ অদিতির ঘাড় ধরিল, মাথাটা নীচু করিয়া ধরিয়া মুখটা মাটির উপর ঘসিয়া দিতে দিতে কহিল, "তোর মুখখানা আজ ছেঁচে দিয়ে তবে জলগ্রহণ কর্‌ব।"

মাড়ি দুইটা কাটিয়া রক্তের ধারায় ঘর ভাসিয়া যায়,—বিস্মিত অদিতি ভাবে, এই ক্ষীণ শরীরে এত রক্ত কেমন করিয়াই বা ছিল !

পবিত্রকুমার অদিতির পত্র পাইলেন, কন্যা লিখিয়াছে—

"শ্রীচরণেষু,

বাবা, অনেকদিন পরে তোমাকে চিঠি লিখ্‌ছি।

এই গৃহে আস্‌বার পূর্ব্বে তোমাকে প্রশ্নে প্রশ্নে অতিষ্ঠ করে' তুল্‌তাম সমাধানের জন্য।—আজকে আমার মনে আবার সন্দেহ জেগেছে, তার উত্তর তুমিই দিয়ো,—কারণ তোমার কথা ছাড়া আমি আর কারও কথাই মেনে চল্‌ব না।—আমি আত্মহত্যা করব, না তোমার কোলে আবার ফিরে যাব ?

—পৃথিবীর ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে যে মর্‌তে চাইছি, এত ভীরু আমি নই,—কিন্তু আমার বিশ্বাস, এর আমূল পরিবর্ত্তন দরকার,—কিন্তু কেমন করে' যে সেটা সম্ভব হ'তে পারে তা আমি জানিনে,—সেইজন্যেই তোমাকে লিখ্‌লাম।

—আমার কোনও কর্ত্তব্য কর্ম্মকে ফাঁকি দিয়ে আমি এড়াতে চাইনে,—পৃথিবীর বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্র থেকে যদি আমার ডাক আসে, তাহ'লে আমি কোনও শক্তির ভয়েই পিছিয়ে দাঁড়াব না।—এদের কাছ থেকে যা পেলাম তা-ও আমার জমা রইল,—তার জন্যে আমি কাউকেই দায়ী করব না।

—তেরো বৎসরের জীবন মস্তবড় জীবন, অথচ সেটাকে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতন আজ ত্যাগ করে' যেতে পারি কারও জন্যই বিন্দুমাত্র দুঃখ অথবা সহানুভূতি অনুভব না করে', এই কথা মনে হ'লেই কষ্ট হয়।

—তুমি আমায় জানিয়ো আমি আত্মহত্যা করব, না তোমার কোলে ফিরে যাব ?—

তোমার দিতু”

পবিত্রকুমার সমস্তই বুঝিলেন। তাঁহার কন্যা যে কত দুঃখে তাঁহার নিকটে এরূপ পত্র লিখিতে পারে তাহা তাঁহার নিকট অজ্ঞাত রহিল না। পত্রোত্তরে তিনি লিখিলেন—

"মা দিতু,

তোমার চিঠি পাইলাম, আমি নিজেকে অপরাধী না মনে করিয়া পারিতেছি না। দূরদর্শিতার গর্ব্ব যাহার যত অধিক সে-ই তত বেশী ক্ষীণদৃষ্টির পরিচয় দেয়,—ইহার দৃষ্টান্ত আমি নিজে। নিজের কন্যাকে নিজের হাতে বলি দিয়াছি, এ কথা যখন আমার মনে পড়ে তখন আর আমি আপনাকে সংবরণ করিতে পারি না।

তোমাকে যে লাভ করিল, অথচ মর্য্যাদা দিল না, সে যে কতবড় দুর্ভাগা তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়।

—আত্মহত্যার কথা মনেও আনিয়ো না। যদি বলি ইহা পাপ, তাহা হইলে কোনও নূতন কথা বলিলাম না। যদি বলি, যে-জীবন তুমি দান করিতে পার না, সে-জীবন গ্রহণ করিবার অধিকারী তুমি নও, তাহা হইলেও মৌলিক কিছু বলি না;— কিন্তু দুইটা উক্তিই সত্য।

এ জীবনে উহাদের ঘর করা ছাড়াও অন্য কাজ কাছে, পৃথিবীর সেই মহত্তর কর্ম্মেই আমি তোমাকে নিযুক্ত করিয়া যাইতে চাই।

—ভুল একবার করিয়াছি, আবারও করিব কি না বলিতে পারি না; কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা সতর্ক হইয়াছি।

তোমার আত্মহত্যা করা যদি সঙ্গত বলিয়া মনে করিতাম,

যদি মনে করিতাম তোমাকে দিয়া এ জগতের আর কিছুই করাইবার নাই, তাহা হইলে তোমাকে মরিতে বলিতাম, দ্বিধা করিতাম না। কিন্তু আমি আমার মা'কে চিনি, সেইজন্যই সমস্ত পৃথিবীর তরফ হইতে তাহাকে সহজে হারাইতে চাহি না। তুমি তোমার পিতামাতার স্নেহের, ভাইবোনদের ভালবাসার ভিতরে পূর্ণ মর্য্যাদায় ফিরিয়া এস।

—জীবনের এই ত্রয়োদশবর্ষব্যাপী বিরোধে তুমি যে পরাজিত হও নাই, তাহা আমি জানি। তেরো বৎসর ধরিয়া যে চেষ্টা এবং যত্ন তুমি করিয়াছ তাহা আমি মনে মনে বুঝি, —সেইজন্যই আজ পাষাণ ভেদ করিয়া গৈরিক নিঃস্রাব যদি বা ছুটিয়া বাহির হইতে চায়, আমি তাহাতে বাধা দিব না।"

—পড়িতে পড়িতে অদিতি চোখের জল মুছিল।

সংসারের সকল সংবাদ জ্ঞাপন করিবার পর পবিত্রকুমার যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া শিশুপুত্রের সহস্র কৌতুক হেরিয়া জননী যেমন সুপ্রসন্ন হাস্যে তাহাকে অভিনন্দিত করেন, তেমনি করিয়া হাসিল,—আপন মনে কহিল, "ঠিক আগের মতনই আছেন,—একটুও বদ্‌লাননি!"

পবিত্রকুমার নিজে অধ্যাপক; সত্যের সহজ পথ ধরিয়া সারল্যের অনাড়ম্বরতায় চলিতে তিনি অভ্যস্ত। মারপ্যাঁচ কিছু বোঝেন না এবং সহ্যও করিতে পারেন না। তবে সময়ে অসময়ে, যত্র তত্র নিজের অধ্যাপনাবৃত্তির অপর্য্যাপ্ত লোভ সংবরণ করিতে পারিতেন না বলিয়া, অদিতির অনেক সন্দেহ

অনুযোগই তাঁহাকে পূর্ব্বে শুনিতে হইয়াছে। তাঁহার আচার্য্যত্বের পরিচয় তাঁহার পত্রের শেষে ছিল,—পবিত্রকুমার লিখিয়াছিলেন—

"তোমার চিঠি পাইয়া আমার আর একটা কথা খুব বেশী করিয়া মনে হইতেছে,—প্র্যাক্‌টিক্যাল এডিউকেশান বলিয়া কোন পদার্থ এ পৃথিবীতে নাই, যাহা আছে তাহা হইতেছে প্র্যাক্‌টিক্যাল নলেজ্ এবং প্র্যাক্‌টিক্যাল এক্স্‌পিরিয়েন্স্; কারণ, যে মুহূর্ত্তে কোন জিনিষ পুঁথি-কেতাব পড়িয়া শিক্ষকের কাছে শিখিতে যাইতে হয়, অথবা কাহারও উপদেশানুসারে হাতে-কলমে করিতে হয়, তখনি সেটা থিওরেটিক্যাল হইয়া ওঠে। আর সে-স্থলে যাহা কিছু শিখান হয়, তাহা আর যাহাই হউক প্র্যাক্‌টিক্যাল্ এডিউকেশান যে নয়, সে কথাটা আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি।

প্র্যাক্‌টিক্যাল্ এডিউকেশান শিখাইতে গিয়া যখনই আমরা মনে করি যে, ইহাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে, তখনি সে প্র্যাক্‌টিক্যালিটির আত্মবোধ আমাদিগকে এতটা থিওরেটিক্যাল করিয়া তোলে, যে মনে হয় আমরা যদি ইহার বিপরীত জিনিষটা শিখাইতে আসিতাম, তাহা হইলে হয়ত আত্মজ্ঞানের অভাবের দরুণ সেইটাই বেশী প্র্যাক্‌টিক্যাল হইত। ইহার প্রমাণ দিতে হইলে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তথাকথিত কার্য্যকরী শিক্ষা পাইয়া যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা ব্যবহার করিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে, তাঁহাদের মাষ্টারি-উপদেশানুসারে লব্ধ এবং বহুকষ্টে অর্জ্জিত

প্র্যাক্‌টিক্যাল এডিউকেশান এবং প্র্যাক্‌টিক্যালিটির মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান !—তখন তাঁহাদের এক হয় সমস্ত অধীত বিদ্যা এবং কার্য্যকরী শিক্ষা ভুলিয়া যাইতে হইয়াছে, আর না হয় ত সেইটাকে আবার নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে কার্য্যকরী বিদ্যা শিক্ষা দিতেছে একথা বলাও যা, আর সোনার পাথর বাটিতে কাঁঠালের আমসত্ত্ব গুলিয়া খাইতেছি, বলাও তা।

কোনও বিদ্যালয়েরই সাধ্য নাই যে কার্য্যকরী বিদ্যা শিখায়, —ওটা শিখিতে হয় জীবনের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে,—তবে সেটাকে যদি কেহ কবিত্ব করিয়া পাঠশালা বলেন তাহা হইলে আমার আপত্তি করিবার কিছু নাই।”—

অদিতি হাসিল, আপন মনে কহিল, “ঠিক বাবার মতন !”—

নিজের জীবনের দুঃখ-বেদনার কাহিনীও পিতার প্র্যাক্‌টি-ক্যাল এডিউকেশান-থিওরীর বাহন হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া সে কৌতুক অনুভব না করিয়া পারিল না।

পবিত্রকুমার শেষে লিখিয়াছিলেন, কন্যাকে তিনি আগামী রবিবার দিন আসিয়া গৃহে লইয়া যাইবেন।

একটা কথা বলা হয় নাই।—বিশ্বতোষের নাম ছিল বিশ্বতোষ, যদিও সে তুষ্ট বড় একটা কাহাকেও করে নাই,—

কিন্তু একেবারে কেহই তাহার উপর প্রীত ছিল না, একথা বলিলেও অতিশয়োক্তির অপরাধ ঘটিবে।

পাড়ার মোড়ে একটা দোকান আছে, তাহারই সম্মুখে একখানা কালো রঙের কাঠের উপরে আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে লেখা, "শ্রীহরকুমার মুখোপাধ্যায়, লাইসেন্সপ্রাপ্ত গাঁজা বিক্রেতা" —তাহার নীচের লাইনে লেখা, "এখানে সস্তায় ভালো জিনিষ পাইবেন।"

—এই হরকুমার বিশ্বতোষের উপর যে-রকম তুষ্ট ছিল সে-রকমটি কলিকালে বড় একটা দেখা যায় না! হরকুমারকে বিশ্বের প্রতীক বলিয়া মনে করিয়া লইলে, বিশ্বতোষের নামের সার্থকতা সম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন তুলিতে সাহস করিবে না,— দুইজনে এমনি ভালবাসা!

উভয়ের গভীর প্রীতির ফলে বিশ্বতোষের যেন-তেন-প্রকারেণ-রূপ যাহা কিছু আয়ের বেশীর ভাগ হরকুমারের বাক্সয় গিয়া উঠিত; এবং বিশ্বতোষের চোখ দুইটাও উত্তরোত্তর রক্তবর্ণ ধারণ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না।

—সেদিন রাত্রি বারোটার সময় বিশ্বতোষ কতকগুলা কাগজ-হাতে চোখ লাল করিয়া আসিয়া কহিল, "ওগো মাষ্টারণী, এই চিঠি ক'খানা লিখে ফেল দিকিনি, দেখি একবার বিদ্যের বহর!"

একটা কাগজ বাহির করিয়া কয়েকটা লোকের নাম-ঠিকানা দেখাইয়া পুনরায় বলিল, "দশটা চিঠি চাই, দশটা কপি—"

পকেট হইতে একটা খবরের কাগজ টানিয়া তুলিয়া, লাল

পেন্সিল দিয়া দাগ-দেওয়া একটা বিজ্ঞাপন দেখাইয়া সে কহিল, "পড়ে' দেখো মাষ্টারণী!"—

এইবার নিজের বুকে হাত দিয়া বিশ্বতোষ বলিল, "শর্ম্মা হেঁজিপেঁজি নয়,—ইচ্ছে কর্‌লে সব করতে পারে!—চিঠিটা কে লিখেছে জানিস্?—গণেশ,—সেই শুঁড়ওলা গণেশ নয়,—মাই ফ্রেণ্ড, আমার বন্ধু—গণেশ,—বই লেখে, এবার ছাপ্‌তে দেবে,—কেমন লিখেছে একবার দেখিস্!"—বলিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—"দশখানা চিঠি কাল সকালে আমার চাই-ই, নইলে মজাটা টের পাইয়ে দেব বাবা, হুঁ্যা!"—বলিয়া বিশ্বতোষ চলিয়া গেল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর, চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। কাগজ-পত্রগুলা হাতে লইয়া অদিতি ভাবিল, ব্যাপারখানা কি?—রান্নাঘরটা ধুইয়া রাখিয়া আসিয়াছিল, ততক্ষণে শুকাইয়া গেছে,—হারিকেনে খানিকটা তেল ভরিয়া দোয়াত কলম লইয়া সেইখানে গিয়া বসিল।

বাড়ীটা সরু অন্ধকার গলির মধ্যে, সেই গলিটার ভিতরে সেইটাই শেষ বাড়ী এবং গলিতে প্রবেশ করিবার মাত্র একটা রাস্তা। গলির মোড়ের একটা গ্যাসের আলোতে গলিটা রাত্রিকালে সামান্য একটু আলো এবং যথেষ্ট পরিমাণ অন্ধকারের ভিতরে বাস করে।

সেই গলিতে কোন কোনও দিন গভীর রাত্রিতে মাদুর পাতিয়া বসিয়া বিশ্বতোষ তাহার কয়েকজন বন্ধুর সহিত গাঁজা খাইত।

তেরো বৎসরের বিবাহিত জীবনে ইহাদের জীবনযাত্রার প্রণালীর কোনও সংবাদ জানিবার জন্য অদিতির বিন্দুমাত্র কৌতূহলের পরিবর্ত্তে অসহ্য ঘৃণা বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু আজ তাহার হঠাৎ কি মনে হইল,—সে নিঃশব্দপদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া সদর দরজাটা একটুখানি খুলিতেই দেখিতে পাইল, একজন বড় দাড়ীওয়ালা লোক বলিতেছে, "আমি কিন্তু ভাই মন্দোদরী সাজ্‌ব—"

আর একটা লোক ফস্ করিয়া প্রশ্ন করিল, "বল্ ত মন্দো-দরীরা ক' ভাই ?"—

হঠাৎ-ছাড়া-পাওয়া চাপা স্প্রিং-এর মতন আর একজন লোক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "বিভীষণ, মন্দোদরী, হনুমান, শিশুপাল, সুগ্রীব, শূর্পণখা—হাহা, হূহু—" বলিতে বলিতে তাহার মাথার ভিতর গণ্ডগোল বাধিয়া গেল, সে বেপরোয়াভাবে কহিয়া চলিল, "অযোধ্যা, বারাণসী, বৃন্দাবন, ক্যাব্‌লা, কল্‌কাতা, তালগাছ, আমি, গণ্‌শা, চিড়িয়াখানা, মরা-সুসাইটি, ভেট্‌কীমাছ, বিশে—"

বিশ্বতোষের নাম করিতেই সে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার গালে ঠাস্ করিয়া একটা চড় বসাইয়া দিয়া নিজেই "ভ্যাঁ" করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল!—

অদিতি দরজা ভেজাইয়া দিয়া নিঃশব্দপদে আবার রান্নাঘরে আসিয়া বসিল, খবরের কাগজটা তুলিয়া লইতেই লাল পেন্সিলে চিহ্নিত অংশটুকু চোখে পড়িল

সত্বর হউন ! সত্বর হউন !!

আর চাকুরীর জন্য ভাবিতে হইবে না,—পয়সার জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। আমরা বহু চেষ্টায়, দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতায় বেকার-সমস্যা-সমাধানের যে উপায় স্থির করিয়াছি, তাহা যেমন নূতন তেমনি অব্যর্থ। মাত্র পনেরো টাকা খরচ করিলেই আমরা আমাদের বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতার ফল আপনাদের গৃহদ্বারে পৌছাইয়া দিব।

একবার ভাবিয়া দেখুন, মুহূর্তমাত্র চিন্তা করুন,—মাত্র পঞ্চদশটি মুদ্রা ব্যয় করিলেই আপনাদের সকল দুঃখ ঘুচিবে!

বিলম্ব করিবেন না, আজই আমাদের নিকট টাকা পাঠাইয়া দিন, অথবা আমাদের 'উপদেশ' ভিঃ পিঃ করিতে আদেশ দিন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—মাত্র নির্দ্দিষ্টসংখ্যক লোককে আমাদের 'উপদেশ' বিতরণ করা হইবে। অতএব বিলম্ব করিলে আমাদের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা আপনাদিগকে হতাশ করিতে বাধ্য হইব।

সত্বর হউন ! সত্বর হউন !!

এই সুবর্ণসুযোগ হেলায় হারাইবেন না।

—নীচে বিশ্বতোষের নাম, এবং খুব সম্ভবতঃ তাহার ফ্রেণ্ড, অর্থাৎ বন্ধু গণেশের ঠিকানা দেওয়া আছে।

অদিতি এইবার তাহাদের 'উপদেশ' পড়িতে আরম্ভ করিল, সেইটারই দশখানা নকল তাহাকে করিতে হইবে।—

বেকার সমস্যার অপূর্ব্ব সমাধান

প্রিয় মহাশয়,

আপনার প্রেরিত পনেরো টাকা পাইয়াছি। আমাদের 'উপদেশ' গ্রহণ সম্বন্ধে আপনার সিদ্ধান্তের জন্য আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন।

আপনাকে আমাদের প্রতিশ্রুত 'উপদেশ' পাঠান যাইতেছে,—অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি নিজেই উহা ব্যবহার করিবেন,—ইহার সম্বন্ধে আর কাহাকেও কোন কথা বলিবেন না, এবং আমাদের লিখিত পত্র অনুগ্রহপূর্ব্বক কাহাকেও দেখাইবেন না। মনে রাখিবেন এ সম্বন্ধে আপনি আমাদের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কেহ কিছু জানিতে চাহিলে, দয়া করিয়া আমাদিগের নাম এবং ঠিকানা তাঁহাকে দিয়া দিবেন এবং পনেরো টাকা পাঠাইয়া সকল সংবাদ জানিতে বলিবেন।

'উপদেশ'

আজকালকার দিনে চাকুরী-টাকুরীর আশা ছাড়িয়া দিন, ব্যবসা করুন,—Business।

শ্যামবাজার ট্র্যামের ডিপো হইতে হাঁটিতে আরম্ভ করুন কালীঘাট ট্র্যামডিপো পর্য্যন্ত।—একটা নোট্‌বুক সঙ্গে রাখিবেন, আর একটা ফাউণ্টেন পেন এবং এক বোতল অথবা এক শিশি কালি,—আর তাহা যদি না পারেন, তাহা হইলে গোটাকয়েক পেন্সিল এবং একটা ছুরি সঙ্গে থাকা চাই,—শুধু নোটবুকে কাজ হইবে না!

এইবার পূর্ব্বদিকের ফুটপাথের উপরকার সমস্ত দোকানগুলার জিনিষের নাম লিখিতে লিখিতে অগ্রসর হউন।—হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা, ছবি, বৃহৎ জ্যোতিষ-কার্য্যালয়, হিন্দু হোটেল,—ভদ্রলোকদিগের আহারের স্থান,—লিখিয়া যান,—থামিবেন না।—

সোজা চলিয়া যান কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট দিয়া, কলেজ ষ্ট্রীট ছাড়াইয়া, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের ভিতর দিয়া ধর্ম্মতলায় গিয়া পড়ুন। ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের দক্ষিণদিকের ফুটপাথ ধরিয়া আগাইয়া যান। এইবার চৌরঙ্গীর পূর্ব্ব ফুটপাথ দিয়া অগ্রসর হউন। তাহার পর আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, তাহার পর রসা রোড।

এইবার পশ্চিম ফুটপাথ দিয়া ঐ প্রকার নোট করিতে করিতে ফিরিয়া আসুন, কেবল চৌরঙ্গীতে চলিবার সময় পূর্ব্ব ফুটপাথের উপরে আসিবেন, দোকানগুলা আবার দেখিবেন,—রিভিযানের কাজ হইবে,—কারণ চৌরঙ্গীর পশ্চিম পাশে কোন দোকান নাই।

ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট দিয়া আসিবার সময় উত্তর ফুটপাথে থাকুন,—

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে পড়িয়া আবার পশ্চিম ফুটপাথ ধরুন, এইবার সিধা চলিয়া যান শ্যামবাজার।—এখন বাড়ী ফিরুন,—নোটবুকটা রাখিয়া দিন, স্নান করিয়া খাইয়া, একটু বিশ্রাম করিয়া লইতে পারিলেই ভালো হয়।

তারপর খাতাটা খুলিয়া এক এক ধরণের জিনিষগুলার আলাদা আলাদা লিষ্ট্ করুন, অবশেষে গণিতে আরম্ভ করুন,—দেখিবেন যোগে ভুল করিবেন না যেন!

যে জিনিষের দোকান সর্ব্বাপেক্ষা অল্প আছে, "দুর্গা" বলিয়া সেই জিনিষেরই একটা দোকান কালবিলম্ব না করিয়া খুলিয়া ফেলুন,—যদি লাভ না হয় তবে কি বলিয়াছি!—

এ সম্বন্ধে আরও কৃতনিশ্চয় হইতে হইলে আমাদের বড়-বাজার-প্যাম্ফ্লেট পাঠকরা আবশ্যক।

আমাদের দ্বিতীয়সংখ্যক পুস্তিকায় তাহার কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার জন্য বিশেষ মূল্য নির্দ্ধারিত আছে। সে সম্বন্ধে বিস্তারীত জানিতে হইলে এক আনার ডাকটিকেট সহ পত্র লিখিতে হইবে।

বিনীত

বেকার-সমস্যা-সমাধান সমিতির পরিচালকবর্গ

—সমস্তটা পড়িয়া অদিতি মনে মনে বিশ্বতোষের ফ্রেণ্ড্ গণেশের বুদ্ধির তারিফ না করিয়া পারিল না। কিন্তু তাহার মনে হইল, ইহা প্রবঞ্চনা, কতকগুলা অভাবগ্রস্ত লোকের

অসহায়তার সুবিধা গ্রহণ করিয়া নিজেদের পেট ভরাইবার হীন ফন্দী ছাড়া ইহা আর কিছুই নহে। এই প্রবঞ্চনায় সে কোন সাহায্যই করিতে পারে না,—তা সে সাহায্য যত সামান্যই হউক না কেন। বাক্য অথবা কার্য্য দ্বারা কোন সহানুভূতিই যদি সে এই উদ্দেশ্যের জন্য প্রকাশ করে তাহা হইলে তাহা অন্যায় হইবে।

কালি, কলম, কাগজ পড়িয়া রহিল,—হারিকেনটা নিবাইয়া দিয়া আঁচল বিছাইয়া শুইয়া, পিতামাতা ভাইবোনদের কথা ভাবিতে ভাবিতে অদিতি ঘুমাইয়া পড়িল।

তাহার পরদিন সকালবেলা যে কাণ্ডটা ঘটিল তাহাকে ঠিক কুরুক্ষেত্রই বোধ হয় বলা চলে।

অদিতি বলিয়াছিল, "আমি চিঠি লিখিনি।"

স্ত্রীর ধৃষ্টতা এবং দুঃসাহসের বহর দেখিয়া ক্রোধে বিশ্বতোষ মিনিট দুয়েক কথা কহিতে পারিল না, পরে বলিল, "তার মানে?"

অদিতি কাগজপত্রগুলা বাহির করিয়া দিয়া জবাব দিল, "এটা প্রবঞ্চনা,—আমি এ কাজে সামান্য একখানা চিঠি নকল করে' দিয়েও তোমাদের সাহায্য করতে পারিনে,—তুমি যেন কিছু মনে কোরো না।"

বিশ্বতোষের মনে হইল; অদিতির মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হইয়া গেছে, তাহা না হইলে এই রকম কথা কোন প্রকৃতিস্থ লোকে কহিতে পারে বলিয়া তাহার ধারণা ছিল না। সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কহিল, "প্রবঞ্চনা! তার অর্থ, এই রকম করলে লোকের ঘরে টাকা আস্‌বে না?"

অদিতি কহিল, "আস্‌তে পারে, না-ও আস্‌তে পারে,—তবুও আমার মনে হয়েছে এটা ঠিক নয়। আমি মন খুলে তোমাদের একাজে কোনও উপকারই করতে পারিনে।—কাগজগুলো নাও, তোমার একটু দেরী হ'য়ে গেল, তা আর কি করবে—"

তাহার পর যে ব্যাপার আরম্ভ হইল তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে যেন ঠিক বিশ্বাস করা যায় না!—

নাক, মুখ, মাথা, কপাল এবং বুক ও পিঠের রক্তে যখন সমস্ত কাপড় লাল হইয়া গেল, তখন সেই নিশ্চল দেহের পানে চাহিয়া শ্বশুর মহাশয় কহিলেন, "হারামজাদী মরে' গেল নাকি?—"

তাহার পরের দিন সন্ধ্যাবেলা,—নয়নতারা তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র সন্তোষের সহিত চীৎকার এবং গালাগালির মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সন্তোষ সন্ধ্যাবেলা নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার জন্য

একটা সিল্কের পাঞ্জাবী কাহার নিকট হইতে জোগাড় করিয়া আনিয়াছিল। কাহার না কাহার পাঞ্জাবী, কোন্ ছোটজাতের কে জানে? অতএব সেটাকে পবিত্র করিবার জন্য নয়নতারা একফাঁকে আসিয়া পাঞ্জাবীটার উপরে গোবরজল ঢালিয়া দিয়া গিয়াছিলেন,—ভরসা ছিল, রাত্রির অন্ধকারে দাগটা সন্তোষের চোখে পড়িবে না,—কিন্তু মাত্রা কিছু অধিক হইয়া যাওয়াতে, জিনিষটার সুগন্ধ সন্তোষের নাকে ধরা পড়িয়া গিয়া মুস্কিল বাধাইল।

—অদিতির জ্ঞান ফিরিয়া আসিল,—সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। তাহার দেহের ভিতরে সূঁচ ফুটাইয়া যেন তাহার সহিষ্ণুতার পরীক্ষা চলিতেছে!

অদিতি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। সে মনে মনে কহিল, "এ গৃহ আজই আমাকে ছাড়িতে হইবে। বাবা লিখিয়াছেন, রবিবার দিন আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন, কিন্তু আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিব না,—তেরো বৎসর আমার সহিয়াছে, কিন্তু আর মুহূর্ত্তমাত্রও আমার সহিবে না।"

সে দেয়াল ধরিয়া উঠিয়া বসিল, দেয়াল ধরিয়াই ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল,—ভাবে বোধ হইল যেন মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবে!

বাহিরের দিকে চাহিয়া অদিতি দেয়ালে পিঠ রাখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সেইদিনকার সকালের পরে যে কয়টা দিন কাটিয়াছে সে ধারণা তাহার ছিল না। দিনের আলো তখন যাই-যাই করিতেছে। হাত-আয়নাটা লইয়া জানালার নিকটে আসিয়া নিজের মুখের পানে চাহিয়া অদিতি মৃদু হাসিল,—কপালে, গালে, চিবুকে, নাকে রক্তগুলা শুকাইয়া রহিয়াছে! নিজের কাপড় এবং সেমিজের পানে চাহিয়া অদিতি আবার ম্লান হাসিল।

নয়নতারা তখন ও-ঘরে সান্ধ্যবৈঠক বসাইয়াছেন।

অদিতি উঁকি মারিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই। দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া সে কলতলায় আসিল। নাকমুখের রক্তগুলা ধুইয়া লইয়া ঘরে ফিরিল; কাপড়-সেমিজ ছাড়িয়া আর একটা কাপড় পরিল,—তাহার পর পা টিপিয়া টিপিয়া সদর দরজার নিকটে আসিতেই শুনিতে পাইল, সুশীলা কহিতেছে, "দুদিনে ওটা মরে' গেল কি না কে জানে,—একবার দেখে আস্‌ব মা?"

নয়নতারা কহিলেন, "চামারের ঘরের মেয়ে অত সহজে মরে না লো,—তোর আর অত সোহাগে কাজ নেই বাছা।"

নিঃশব্দে দুয়ার খুলিয়া অদিতি বাহির হইয়া গেল।

গাড়ীতে বসিয়া অদিতি অনুভব করিতে লাগিল, তাহার হাতের শাঁখা, তাহার কপালের সিঁদূর যেন তাহাকে গভীর

নরকের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।—মনে হইল, যে জীবনকে পাপ মনে করিয়া, অন্যায় বিবেচনা করিয়া পশ্চাতে ফেলিয়া আসিল, সেই জীবনের জয়ধ্বজা সে নিজের অঙ্গেই বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে! কথাটা স্মরণ হইতেই কাপড়ের আঁচল দিয়া অদিতি কপালের সিঁদূর মুছিয়া ফেলিল, হাত দুইটা দিয়া পাগলের মতন ব্যস্তভাবে সিঁথির সিঁদূর ঘসিয়া ঘসিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল। গাড়ীর জানালার উপরে আছড়াইয়া আছড়াইয়া শাঁখা দুইটা ভাঙ্গিতে গিয়া হাত কাটিয়া গেল,—কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করিবার মতন অবসর যেন তাহার তখন ছিল না। ওই সিঁদূরে যেন তাহার কপাল পুড়িয়া যাইতেছিল,—ওই শাঁখাতে যেন তাহার হাত জ্বলিতেছিল! তাহার নব-জীবনের প্রভাতে ইহারা যেন তাহাকে মাথা তুলিতে দিবে না, তেরো বৎসরের দুঃস্বপ্ন-শেষে তাহার প্রথম জীবনে ফিরিবার পথে ওই শাঁখা-সিঁদূর যেন প্রহরী!

পথ ত আর শেষ হয় না—এলগিন রোড আর কতদূর!

শ্রান্ত অদিতি জানালার উপরে মাথা রাখিয়া মনে মনে কহিল, "আজ চলিলাম, ফিরিয়া চলিলাম,—রাত্রির দুঃস্বপ্ন ভুলিয়া যাইব, জীবনটাকে আবার ঢালিয়া সাজিব।"

গেটের ভিতর দিয়া বাহিরের বাগান পার হইয়া গাড়ী-বারান্দার নীচে আসিয়া গাড়ী থামিল।

কুমারী অদিতি ত্রয়োদশ বর্ষ পরে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। সে তাহার দেহের ব্যথা, সকল দুঃখ, সর্ব্ব অসম্মান

ভুলিয়া গেল'।—এই তাহার পিতার গৃহ, তাহার মাতার সংসার, তাহার ভাইবোনদের সুখনীড়, তাহার শৈশব ও কৈশোরের স্বর্গ!

দোতলায় উঠিতে উঠিতে সে বারবার সিঁড়ির ধূলাগুলা গায়ে মাথায় মাখিয়া আপন মনে কহিতে লাগিল, "আমার পিতৃভবন, আমার শৈশবের খেলাঘর, আমার নিজের ভিটা,—তোমার কোল ছাড়িয়া দুইদিনের খেলা খেলিয়া আসিলাম, পিছনের জঞ্জাল পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি,—পায়ে পায়ে আর কোনও আবর্জ্জনাই জড়াইব না,—তোমায় ফেলিয়া থাকিতে পারিলাম না, পরের ঘরের দুঃখ বহিয়া তোমার কাছেই ফিরিয়া আসিলাম,—তোমার সুনিবিড় স্নেহের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়ো, সে স্নেহ হইতে আর আমায় কোনদিন দূরে সরাইয়া দিয়ো না, শেষ নিশ্বাস যেন তোমার বুকে থাকিয়াই ফেলিতে পারি।"—

বরণডালা

প্রফুল্লকুমার কলিকাতার কোন মেসে থাকিয়া লেখাপড়া করে। পিতা জমিদারী ষ্টেটের ম্যানেজার। সেদিন তাঁহারই কাছ হইতে পত্র আসিয়াছিল।—

ক্ষেমাস্পদেষু,

পরমশুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনমিদং। পরে বাবাজী তোমার মঙ্গল শ্রীশ্রী৺স্থানে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি।

তোমার লেখাপড়া সম্ভবতঃ উত্তম প্রকারেই প্রস্তুত করিতেছ। শ্রীশ্রী৺পূজা সমাগতপ্রায়। তোমার অবকাশের আর কত বিলম্ব আছে? অবকাশ হওয়ামাত্র কালক্ষেপ না করিয়া দেশাভিমুখে রওয়ানা হইলে, আনন্দলাভ করিব।

তোমার জ্ঞাত কারণ জানাইতেছি, মনিবের কার্য্যব্যপদেশে বরণশাহীতে গমন করিয়া এক অত্যন্ত দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎকার লাভ করি। কন্যাকে সৎপাত্রস্থা না করিতে পারায় ব্রাহ্মণের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না, অবশেষে তিনি আমার হাতে পায়ে ধরিয়া পড়িলেন।

তোমরা সকলেই বড় হইয়াছ, এখন তোমাদিগকে রাখিয়া এ পৃথিবী হইতে যাইতে পারি, ইহাই মঙ্গলময় ভগবচ্চরণে অহর্নিশ প্রার্থনা। কিন্তু সংসারবন্ধন ছিন্ন করিতে চাহিলেই যদি তাহা পারা যাইত, তাহা হইলে ত আর কোনও চিন্তাই ছিল না।

—আজ পক্ষকাল গত হইল তোমার নূতন-মা'কে লইয়া গৃহে ফিরিয়াছি।—নারায়ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ব্রাহ্মণকন্যা অত্যন্ত সুশীলা, এবং ব্যবহারের দ্বারা এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সকলের প্রশংসালাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ইহা আমার পক্ষে সান্ত্বনার কথা।

—বাতব্যাধিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছি, দন্তশূলের যন্ত্রণাও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নপঙ্‌ক্তির একটি দাঁতও আর অবশিষ্ট নাই, উপরের পঙ্‌ক্তিরও অনেকগুলা গিয়াছে। যে কয়টা আছে সেগুলা অত্যন্ত নড়িতেছে, কিন্তু সহজে যে পড়িবে এমতও বোধ করিতেছি না। আর অধিক দিন এই আধিব্যাধিপূর্ণ সংসারে বাস করিব না—ইহাই একমাত্র ভরসা।

—আর একবার দারপরিগ্রহ করাতে তোমার বড়দাদা বিশেষ সন্তুষ্ট হয় নাই। সে বরাবরই একরোখা মানুষ, তাহার বুদ্ধিসুদ্ধিও বিশেষ আছে বলিয়া কোনদিন মনে করি নাই।

বিবাহে আমারও মত ছিল না,—আমার গৃহধর্ম্ম ভগবানের অভিপ্রেত হইলে আর তিনি তিন তিনবার এমন করিয়া চোখে আঙ্গুল দিয়া তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতেন না। কিন্তু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে—সংসার আমার পক্ষে অরণ্যস্বরূপ, অসুখ হইলে কে-ই বা সেবা করে? বাতব্যাধিতে ত প্রায়ই উত্থানশক্তি-রহিত হইয়া পড়িয়া থাকি—একফোঁটা জল গড়াইয়া দেয় কে? এই যে দন্তহীন মুখে কোন জিনিষ ভালো করিয়া চর্ব্বণ করিতে পারি না বলিয়া কিছু হজম হইতেছে না, এই যে দাঁতের অভাবে এত কষ্ট পাইতেছি, এ সকলেরই বা খবরদারী কে করে? —মেয়েরা ত শ্বশুরবাড়ীতেই, তোমার কনিষ্ঠা যে দুইজন আছে, তাহারা ত নিজেদের খেলাধূলা, পড়াশুনা এবং ভাইপো, ভাইঝি-দের লইয়া আদর করিতেই ব্যস্ত। নিজের ছেলেদের তদ্বির করিতেই ত বধূমাতাদের দিন কাটে!

তোমার বড়দাদা রাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, পুত্রকন্যা নাতী-নাত্নী, পুত্রবধূরা সকলে মিলিয়াও কি আমার শুশ্রূষা করিতে পারিত না?

ইহা রাগারাগির কথা নয়,—আমার শরীর দিন দিন খারাপ হইতেছে, অথচ তেমন সেবা হইতেছে কই? তবুও তোমার দাদাকে যদি সে কথা বুঝাইতে যাই, তবে সে অসন্তুষ্ট হয়! যাক্ সকলই আমার অদৃষ্ট!

তোমার টাকা কয়েকদিন পরে পাঠাইতেছি। বৌমাদের, ছেলেমেয়েদের, তোমার বড়দা-মেজদা'র, তোমার নূতন-মা

প্রভৃতির জন্য পূজার বাজার তোমাকেই করিয়া আনিতে হইবে, বস্ত্র ও দ্রব্যসামগ্রীর ফর্দ্দ এবং উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ পরে প্রেরণ করিব।

—আমার শ্বশুরমহাশয় সেদিন এখানে আসিয়াছিলেন,—তোমার বড়দা' তাঁহাকে দেখিয়া আমাকে বলিল, "আপনি বলিলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কিন্তু ইনি ত আমার সমবয়সী হইবেন!"

তোমার বড়দা'র ধারণা, সে নিজে বৃদ্ধ নয়, তাহার সমবয়সী লোকদের বৃদ্ধ বলা চলে না! সে এইরূপ ভাব দেখায় যেন আমার শ্বশুরমহাশয়কে 'বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়া আমি একটা গুরুতর অপরাধ করিয়াছি!

তাহার কথাবার্ত্তার মধ্যে একটা ইঙ্গিত সব সময়েই প্রচ্ছন্ন এবং পরিস্ফুট দেখি, আমার আয়ুষ্কাল আর বেশীদিন নয়, অতএব আমার মৃত্যুর বাঁধনে আর একটি বালিকার মৃত্যুকে বাঁধিয়া অন্যায় করিয়াছি!

এ সকল কথা আমার পক্ষে পীড়াদায়ক। আমার আয়ুর সংবাদ তোমার বড়দা' কেমন করিয়া টের পাইল, তাহা জানি না। আমার বয়স হইয়াছে বলিয়াই যে আমি পূর্ব্বে গত হইব, এবং তোমার নূতন-মা'র বয়স কম বলিয়াই যে তিনি আমার পরে মরিবেন, এ ধারণা মনে পোষণ করিয়া তোমার বড়দা' নিয়তিকে উপহাস করিতে চায়। ইহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে তোমার পূর্ব্বের মায়েরা পরলোকগতা হইতেন না! তাঁহারা বয়সে আমার অপেক্ষা ছোট ছিলেন, এবং তোমার

দাদার যুক্তি অনুসারে বাঁচা উচিত ছিল তাঁহাদের, যাওয়া উচিত ছিল আমার, অথচ আমিই বাঁচিয়া আছি!—কিন্তু এসব কথা লইয়া আলোচনা করিতে ক্লেশ অনুভব করি।

আর যদি বাস্তবিক তোমার নূতন-মা'র পূর্ব্বেই এখান হইতে যাইতে পারি, তোমাদের সকলকে রাখিয়া সেই দিব্যধামে যাইবার মতন সৌভাগ্য যদি সত্যই আমার হয়, সেই পরমবাঞ্ছিত দিবস যদি আগতপ্রায় হইয়াই থাকে, তাহা হইলে এমন আশা কি করিতে পারি না যে, তোমরা সকলে মিলিয়া তোমার নূতন-মা'র সামান্য ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিবে?

- তোমার বড়দা' ত প্রায়ই আমার সম্ভাব্য মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে, কিন্তু সে নিজেও ত অমর হইয়া পৃথিবীতে আসে নাই! মরিব ত আমরা সকলেই একদিন, বারংবার নানাপ্রকারে সে কথাটা বলিয়া লাভ কি?

—জীবন-বীমার দালালেরা হিতৈষিতা দেখাইতে আসিয়া যখন বলে, "ধরুন আপনি আপনার বীমার টাকার মাত্র এক কিস্তী দিয়াই যদি আগামী কল্য মারা যান, তাহা হইলে আপনার স্ত্রীপুত্রপরিজনেরা সম্পূর্ণ টাকা পাইবে,—" তখন তাহাদের শুভানুধ্যায়িতায় মন যতটা পীড়িত হয়, তোমার দাদার হিতাকাঙ্ক্ষিতায় তাহার অপেক্ষা কোন অংশে কম হয় না।

—আমাকে শীঘ্রই সদরে যাইতে হইবে,—শানপুরের চৌহদ্দি লইয়া রায়েদের সহিত বিবাদ বাধিয়াছে,—আমি না গেলে

তাহার মিটমাট অসম্ভব। তোমার প্রয়োজনীয় অর্থ সদর হইতেই প্রেরণ করিব।

—আবার বিবাহ করিতে আমার যথেষ্ট আপত্তি ছিল,—মাসখানেক পূর্ব্বেও যখন বড়বাবু আমায় এ সম্বন্ধে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে অমত জানাইয়া বলিয়াছিলাম, "পুত্রকন্যাদিগের মধ্যে ত আর কেহ ছোট নাই যে, তাহার লালনপালনের নিমিত্ত আবার বিবাহ করিতে হইবে,—তবে, নিজের সেবাশুশ্রূষার কথা, সে যখন অপর কেহ তৎসম্বন্ধে কোনও চিন্তাই করে না, তখন আর বারংবার ওরূপ বিড়ম্বনায় প্রয়োজন কি?"—কিন্তু বরণশাহীতে ওই ভদ্রলোক যেরূপ নির্ব্বন্ধসহকারে আমাকে ধরিয়া পড়িলেন, তাহাতে আমার "না" বলিবার উপায় রহিল না।

তোমার দাদা বলে, তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বরুণার অপেক্ষাও নাকি তোমার নূতন-মা বয়ঃকনিষ্ঠা!—তোমার দাদার চিরকালই সকল কথা বাড়াইয়া বলা স্বভাব। তোমার নূতন-মা এবং বরুণা বড় জোর সমবয়সী হইতে পারে, বরুণা কিছুতেই বড় না!

আমি সেদিন রান্নাঘরের পাশ দিয়া নীলপুকুরে স্নান করিতে যাইবার সময় দেখিলাম, তোমার বড়দা' ভারী-গলায় বড়-বধূমাতার কাছে বলিতেছে, "ওই শিশু মেয়েটাকে এমন করিয়া বলি দেওয়া—"

ভাবিলাম, আমি কি আজই মরিয়াছি?—তোমার বড়দাদা কি মেঠো-বক্তা হইয়া উঠিল?

এই সকল অত্যন্ত গরম গরম কথা শুনিয়া, আমি তোমার নূতন-মা'কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমার সহিত বিবাহ হওয়াতে দুঃখে শোকে বেচারার বুক ফাটিতেছে কি না! তোমার নূতন-মা কথা না কহিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন,—না, তিনি শান্তিতেই আছেন।

আমিও তাহাই বলি,—দরিদ্রের কন্যা, কোথায় কাহার হাতে পড়িয়া সারাটা জীবন অনশনে অর্দ্ধাশনে মরিতেন—তাহার চেয়ে এ কত ভালো হইয়াছে! খাওয়া-পরার ভাবনা নাই, সুখ-সুবিধার সীমা নাই,—বিধবা হইলেও কোনও অভাবই সহ্য করিতে হইবে না কোনদিন! আর সিঁথির সিঁদূর লইয়া, আমার পায়ে মাথা রাখিয়া যদি—এ সকল কথা তর্কের খাতিরে বলিতেছি, এরূপ ঘটনা যে আমার ঈপ্সিত তাহা নহে যদি তিনি আমার পূর্ব্বেই যাইতে পারেন, তবে তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবন্তী কে?

তোমার নূতন-মা'র যদি দুঃখ হইত, তাহা হইলে কি তিনি কিছু বলিতেন না?

আমি ত দেখি, অত্যন্ত নিঃশব্দে তিনি সমস্ত দিন ঘর-সংসারের কাজ করেন, রাগ নাই, বিরক্তি নাই, ক্লান্তি নাই।

তোমার দাদা সেদিন বলিল, শত অত্যাচার, সহস্র অপমান প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু যে মুখ বুজিয়া সহ্য করে, জীবনভোর নিত্য অসম্মানের অজস্র ইঙ্গিত কুড়াইয়া, সর্ব্বগ্লানির কার্ব্বন ডায়ক্সাইড বিষকে বনস্পতির মত পান করিয়া প্রতিদানে শুধু অক্সিজেনের

অমৃতনিষেকে পৃথিবীকে যে স্নান করায়, তাহারই নাম বাংলার মেয়ে, বঙ্গের বধূ। তোমার দাদার মতে, বাংলার মেয়ে শিবের মত নীলকণ্ঠ,—অঞ্জলি ভরিয়া গরল পান করিয়া, পীযূষ বিলাইয়া দেবী হইয়া গেছে! তোমার দাদা বলে, সর্ব্বদেশের সর্ব্বযুগের নারীসমাজে শ্রেষ্ঠ আসন বাংলার কন্যা না চাহিয়াই পাইবে। সে-আসন হইতে হাত বাড়াইলে আকাশ ছোঁয়া যায়—আর কোনও দেশের মেয়ে নাকি তার নাগাল পায় না!

তোমার দাদা যে শুধু উকীল তাহাই নয়, সে রসায়নবিদ, এবং দার্শনিক ও কবিও বটে।

তোমার নূতন-মা'কে ঘরে আনার মধ্যে যে এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সমস্যা ছিল, তাহা কি পূর্ব্বে জানিতাম!

—তোমার বড়দা' একবার বলে, "এমন নীরবে, এমন শান্ত, ঔদার্য্যের সহিত সকলকে ক্ষমা করিয়া, রিক্তহস্তে জীবনের বন্ধুর পথে যাত্রা করিতে পারে শুধু বাংলার মেয়ে।"—আবার অন্য সময়ে বলে, "এই শিশু, সংসারের কোন্ খবর এ জানে? পৃথিবীর কণ্টকসমাকীর্ণ পথে আরও কতকাল কেমন করিয়া ইহাকে চলিতে হইবে, তাহার কিছুমাত্র কি এ এখনও বোঝে? —ইহার পাথেয় কই, ইহার সম্বল কই?"

উকীল হিসাবে তোমার দাদার যথেষ্ট সুনাম আছে,—কিন্তু এক্ষেত্রে সে তাহার নিজের মোকদ্দমা নিজে মাটি করিতেছে। স্বীয় অবস্থাটা সম্যকরূপে বুঝিবার মত বয়স যদি তোমার নূতন-মা'র না-ই হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে তাঁহার চিত্তে

সত্যকার কোনও দুঃখই উদিত হয় নাই, এই সিদ্ধান্তই কি যথার্থ নয়?

তোমার দাদা যে কি বলিতে চায়, তাহা আমার বোধগম্য হয় না,—মোটের উপরে বুঝিতে পারি যে, সে সন্তুষ্ট হয় নাই এবং বাড়ীসুদ্ধ সকলকেই তাহার মতাবলম্বী করিয়া তুলিতেছে।

—ওকালতিতে সে যথেষ্ট পয়সা উপার্জ্জন করে, এবং আমার সম্পত্তির উপরেও তাহার কোনই আকর্ষণ দেখি নাই কোনদিন, নহিলে তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিতাম।—

সে এক সময় বলে যে, তোমার নূতন-মা যখন তাহার অবস্থাটা ঠিক করিয়া অনুভব করিতে পারিবেন, সেদিনই নাকি তাঁহার মৃত্যু হইবে! তাহার মতে, এ যেন দুপুররাতের ভূমিকম্পে মাথার উপরে গৃহপতন,—অকস্মাৎ চমকিয়া যে মুহূর্ত্তে ভয় পাইয়া মানুষ জাগে, তাহার পরমুহূর্ত্তেই নাকি চিরকালের জন্য জ্ঞান হারায়! আজ তোমার নূতন-মা সহজে কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না, কিন্তু নীড়হারা মন কোন্ সুদূরে ভাসে,—তাঁহার জীবনে একটা অত্যন্ত দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, এখনই নাকি তিনি ইহার আভাস পাইতেছেন, যেদিন অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া একথা তিনি বুঝিবেন, সেদিন তাঁহার সুপ্রসন্ন চিত্তকে আমরা হারাইব,—সেই হইবে নাকি এ গৃহ হইতে তাঁহার বিদায়!

তোমার দাদা যে কত কথাই বলিতে পারে!—সমস্ত শুনিয়া আমার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে, সুস্থ শরীরকে নিরর্থক ব্যস্ত করিয়া তোলা ছাড়া তাহার আর অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই।

এক একবার মনে হয়, তাহার কি মক্কেলের অভাব হইয়াছে? কোর্টে কি আজকাল তাহার যথেষ্ট কর্ম্ম জুটিতেছে না? কিন্তু প্রতিমাসে সে যে-রকম পকেট ভর্ত্তি করিয়া টাকা আনে, তাহাতে সে ধারণাই যে সত্য, তাহাই বা বলি কেমন করিয়া?

—শুনিতেছি, কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিয়াছে।—তুমি সাবধানে থাকিয়ো। ভবতারণদের বাড়ীর কোনও সংবাদ অনেক দিন যাবৎ পাই না। তাহাদের বাড়ীর কে কেমন আছে, তোমার অবসরমত একদিন জানিয়া আসিয়ো।

শানপুর হইতে হয়ত আমাকে সীমগঞ্জ যাইতে হইবে। বড়-নদীর মাছের বন্দোবস্ত লইয়া ছোট তরফের সহিত মনোমালিন্য অনিবার্য্য। একটা রফা-নিষ্পত্তি করা আমাদের মনোগত বাসনা।

—তোমার দাদা এই অত্যন্ত সহজ কথাটা কিছুতে বুঝিতে চাহে না যে, তোমার নূতন-মা'কে আমাদের গৃহে আনিয়া আমার শ্বশুরমহাশয়কে আমি কত বড় একটা দায় হইতে মুক্ত করিয়াছি। সর্ব্বস্ব খরচ করিয়া, পিতৃপিতামহের ভিটামাটিটুকু পর্য্যন্ত শেষ করিয়া হয়ত তিনি একটি তথাকথিত সুপাত্রের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতেন,—এবং তাহার পরে নিজে আজীবন ভুগিয়া মরিতেন এবং তৎসঙ্গে ভুগিতেন তাঁহার কন্যাটি,—এক দফা, পিতাকে নিঃস্ব করার জন্য আত্মগ্লানিতে, দুই দফা, শ্বশুরগৃহের এবং স্বামীর চমৎকার আচরণে!—এই যে আমাদের বৃহৎ ধনী-পরিবারে, তোমার নূতন-মা ওইটুকু মেয়ে হইয়াও সর্ব্বময়ী কর্ত্রী

হইয়া বসিলেন, এই যে তাঁহার পিতাকে একটী অচল পাই পয়সা অবধি কন্যার বিবাহের জন্য খরচ করিতে হইল না, ইহার জন্য কি তোমার নূতন-মা এবং তাঁহাদের পরিবারস্থ লোকেরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ ন'ন্ ?

তোমার দাদার বড় বড় কথার অনেক সময় অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। সে বলিতেছে, তোমার নূতন-মা হয়ত সারাজীবন তাঁহার দুঃখের কোন কথাই বলিবেন না,—কিন্তু কোন্‌দিন গৃহকোণে বসিয়া লোকলোচনের অগোচরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবেন,—কেহ সে সংবাদ জানিবে না,—ছোট একটুখানি নিশ্বাস, অথচ তাহাতেই নাকি উল্টা হাওয়ায় পৃথিবীর পাল ছিঁড়িবে!—আজ হউক, কাল হউক, এক বছর পরে হউক, দশ বছর পরে হউক,—ইহা নাকি একদিন ঘটিবেই!—বিপদ মন্দ নয়! তোমার নূতন মা যদি মুখ ফুটিয়া কিছু বলেন, তাহা হইলে তোমার দাদা তাহার ওকালতি বুদ্ধিতে একটা, চমৎকার মোকদ্দমা খাড়া করিবে ;—আর যদি তিনি সমস্ত জীবনেও কিছু না বলেন, তাহা হইলে তোমার বড়দা' তোমার নূতন-মা'র দুঃখ, শোক, বেদনা, অশ্রু, মায় দীর্ঘনিশ্বাস অবধি কল্পনা করিয়া লইয়া আরও চমৎকার এক আর্জ্জি গড়িয়া তুলিবে!—এ-রকম উকিল লইয়া সংসারে বাস করা দুরূহ ব্যাপার সন্দেহ নাই!

—আমি কোনদিন ওকালতি করি নাই, দালালি করাও আমার ব্যবসা নহে, সেইজন্যই তোমার দাদার কথার ইনাইয়া বিনাইয়া জবাব দেওয়ার মত সামর্থ্য আমার নাই।—আমি শুধু এইটুকুই

বলিতে পারি যে, গুরুজনদের সম্বন্ধে তাহার আর একটু বেশী শ্রদ্ধা থাকিলে আমার পক্ষে সংসারে বাস করা সহজ হইত।

তোমার নূতন মা'র বয়স হয়ত কম হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার পিতা, মাতা এবং অন্যান্য গুরুজনেরা সকলেই কিছু শিশু ন'ন। তাঁহারা তোমার নূতন-মা'র শত্রু না, এবং পৃথিবীর সমস্ত ন্যায়বিচারবোধ তোমার দাদার একচেটিয়া না।—তোমার নূতন-মা'র সেই সকল পরমাত্মীয়েরা তাঁহাদের কন্যার পক্ষে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা শুভ ও কাঙ্ক্ষণীয় তাহাই করিয়াছেন,—অথচ এ সকল যুক্তি তোমার দাদার সম্মুখে উপস্থিত করার জো নাই!—এ সংসারে তাহার অপেক্ষা বড় হিতৈষী তোমার নূতন-মা'র কেহ কোনদিন ছিল অথবা আছে বলিয়া সে স্বীকার করে না!

আত্মীয়-স্বজনেরা সকলেই তোমার বড়দা'র বুদ্ধির এবং স্বভাবের নিয়ত প্রশংসা করিয়া তাহার মস্তকটি উত্তমরূপে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস! তাহার মত আহম্মক আমি ত এ সংসারে আর দু'টি দেখিলাম না!

আগতে তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল লিখিয়া সন্তুষ্ট করিয়ো! অত্রৈব সমস্তই মঙ্গল। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

আশীর্ব্বাদক—শ্রীঅদ্বৈতচরণ দেবশর্ম্মণঃ

বিদ্রূপ

পাঁচের-এক নম্বর ভবনের নূতন অধিবাসীরা আসিয়াছিলেন। কোথাকার কোন এক জমিদার অনেক লোকজন, লটবহর লইয়া আসিয়া একদিন পাঁচের-একে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

উমেশচন্দ্রের বাড়ীর নম্বর পাঁচ, পাঁচের-এক তাহার পাশেই অবস্থিত,—এবং এ গৃহের মালিকও তিনিই। পাশাপাশি খানসাতেক বাড়ী, সবগুলাই উমেশ বাবুর। গঙ্গার তীরে গৃহ-গুলি,—অতএব অবস্থান খুব ভালো নহে। কালীঘাটের গঙ্গার পারত্রিক ব্যাপারে অনেক গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু দৃশ্যসৌন্দর্য্য এবং স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য তাহার প্রথম পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা হয়ত কম। কিন্তু পুণ্যালোভাতুর নরনারীর সংখ্যা বাংলাদেশে তাই বলিয়া অল্প নহে,—ভগবৎ-চরণে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে যাহারা প্রস্তুত, সামান্য স্বাস্থ্যের ভয়ে তাহারা ঘাব্ড়ায় না!

ইহাই নিয়ম

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র এঞ্জিনীয়ার,—তাঁহারই সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া পলতাগাঁয়ের জমিদার প্রিয়নাথ পাঁচের-একে তাঁহাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার লইয়া উঠিলেন।

প্রিয়নাথ বলিলেন, "মা'র অবস্থা খারাপ, গাঁয়ের ডাক্তাররা বল্‌ল যে, আর বাঁচ্‌বেন না।—ওঁর আবার গঙ্গাতীরে মরবার সখ, তাই নিয়ে এলাম কালীঘাটে। তা আপনার খরচ পড়্‌ল অনেক—শুধু ওঁকে আন্‌লেই হ'ল না, একান্নবর্ত্তী পরিবার কিনা, তাই আন্‌তে হ'ল বাড়ীসুদ্ধু সবাইকেই কালীঘাট দেখাবার জন্যে। আপনার রেলগাড়ী ভাড়াতেই খরচ পড়ে' গেল ঢের,—একবার হিসেব করুন—"

ভদ্রতার খাতিরে উমেশচন্দ্র বলিলেন, "তা খরচ একটু বেশী পড়বেই ত—"

প্রিয়নাথ কহিলেন, "আমি কিন্তু মরব দেশে,—নিজের বাগানের কাঠ, যত খুসী নিলেই হ'ল, কানাকড়িটি খরচ নেই, গাড়ীভাড়ার চিন্তা নেই,—নিজের জমিজায়গা, মন্দির বানাও, আশ্রম বানাও, যা তোমার ইচ্ছে, নিজের জমিদারীর ভেতর, কে তোমাকে ঠেকাচ্ছে?—আর এখানে কত অসুবিধে!—"

প্রিয়নাথের মাতার সম্বন্ধে যে সংবাদ পাইলেন তাহাতে উমেশচন্দ্রের মনে হইল, আর দু'চার দিনের মধ্যেই হয়ত বৃদ্ধা

গঙ্গাতীরে দেহ রাখিবেন।—তাঁহার যথেষ্ট বয়স হইবার কথা এবং হইয়াছেও,—চলংশক্তি এবং বাক্‌শক্তি রহিত অবস্থা; শরীরের বামপার্শ্ব পক্ষাঘাতে অবশ।—জীবনের গভীরতম অমানিশা তিনি পার হইয়া আসিয়াছেন, এইবার নবসূর্য্যোদয়ের পানে যাত্রা আরম্ভ করিলেই হয়।—কিন্তু পশ্চিম দিগন্তে অপরাহ্ন বেলায় যে দিবাকর ম্লান মৃত্যুপাণ্ডুর, মানুষ তাহার জন্য শ্লোক রচনা করে না।

প্রিয়নাথ বলিলেন, "মাতাঠাকুরাণীর ত গত হওয়ার সময় হয়ে এল,—ওঁর চিতার ওপর একটা মঠ দিতে চাই,—এই ছোট্টখাট্ট একটুখানি। কিন্তু বাইরেটা বেশ বাহারে হওয়া চাই, পলতাগাঁয়ের যেন তাতে মুখরক্ষে হয়! ভেতরে কিন্তু আমি থার্ড ক্লাস ইঁট দেব তা বলে' রাখ্‌ছি,—আপনি একটু সস্তায়-টস্তায় করে' দেবেন,—দেখুন দিখিনি হিসেব করে' কত পড়বে—"

বৃদ্ধা পুত্র, কন্যা, নাতি, নাত্নী এবং পুত্রকন্যাদের নাতি নাত্নীদিগের অবধি সকলেরই "কর্ত্তা-মা"।

প্রিয়নাথের বাড়ীর কয়েকটি ছেলেমেয়েকে তাঁহার বাড়ীর উঠানে খেলা করিতে দেখিয়া উমেশচন্দ্র একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের 'কর্ত্তা-মা' কেমন আছেন?"

একটি ছোট মেয়ে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "খারাপই ত ছিলেন, এখন ভালো হ'য়ে উঠ্‌ছেন! দেশ থেকে আস্‌বার সময় বাবা বলেছিলেন, 'কর্ত্তা-মা'র একটা কিছু হ'য়ে গেলেই আমাদের চিড়িয়াখানা, মরা-সুসাইটি দেখিয়ে নিয়ে দেশে ফির্‌বেন,—তখন বলেছিলেন সবসুদ্ধ এক মাসও লাগবে না,—এখন এদিকে আমার গঙ্গাজলের ছেলের সঙ্গে পুতুলের বিয়ের তারিখ পার হ'য়ে গেল—" বলিয়া মেয়েটি মুখ ভার করিয়া কহিল, "সই যে কি ভাব্‌ছে!"—

প্রিয়নাথ বলিলেন, "লোকসানী বরাত মশাই, আপনার এক মাসের বাড়ীভাড়া পাওনা হ'ল,—ওদিকে কাজকর্ম্ম সব রইল পড়ে',—বলে' এসেছিলাম মাসখানেকের মধ্যেই ফির্‌ব, অথচ এদিককার কোনও বন্দোবস্তই এখন পর্য্যন্ত হ'ল না;—হয়ত সবাইকে নিয়েই শেষ অবধি দেশে ফিরতে হ'বে! আবার হয়ত কিছুদিন পরে সবাইকে নিয়েই এখানে আস্‌তে হ'বে!—লোকসানী বরাত ছাড়া কখনও এমন হয় শুনেছেন?"

একটু থামিয়া বলিলেন, "আমি ভাব্‌ছি প্রায়শ্চিত্তের বন্দোবস্ত কর্‌ব, বেশী খরচপত্তর করে' নয়, এই অল্পেস্বল্পে! তাতে ত অনেক সময় এস্‌পার ওস্‌পার হ'য়ে যায় শুনেছি। যাই হ'ক, একটা কাজ ত' এগিয়ে থাক—আপনি কি বলেন?"—

উমেশচন্দ্র সংবাদ পাইলেন, বৃদ্ধা ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন, আজকাল বিছানায় উঠিয়া বসিতে পারেন, হাত নাড়িয়া, মুখ নাড়িয়া ধীরে ধীরে কথা কহিবার চেষ্টা করেন!

প্রিয়নাথ কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের সমস্ত আয়োজন করিলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহার মাতার প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল।

সকালবেলা প্রাতর্ভোজনে হাত দিবামাত্রই পাঁচের-এক হইতে কোলাহল উত্থিত হইল। উমেশচন্দ্র স্ত্রীকে বলিলেন, "প্রিয়নাথবাবুর মা বোধহয় মারা গেলেন।"

—পাঁচের-এক নম্বরে আসিয়া উমেশচন্দ্র ডাকিলেন, "প্রিয়নাথবাবু—"

প্রিয়নাথের কনিষ্ঠা কন্যা বাহির হইয়া আসিল, কান্নার আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া বলিল, "বাবা মরে' গেছে—"

উমেশচন্দ্র কহিলেন, "প্রিয়নাথবাবুকে ডেকে দাও ত খুকী। —তোমাদের 'কর্ত্তা-মা' মারা গেলেন কখন?"

মেয়েটি কহিল, "বাবা মরে' গেছে—"

বিস্ময়স্তম্ভিত উমেশচন্দ্র কহিলেন, "কি বল্‌লে?"

বিষয়টা পরিষ্কার হইল যখন প্রিয়নাথের মেজ ভাই ভূতনাথ বাহিরে আসিয়া দেখা দিলেন। উমেশচন্দ্র শুনিলেন, 'কর্ত্তা-মা' বেশ ভালোই আছেন, কবিরাজ ভরসা দিয়া গিয়াছেন যে ভালো

রকম তদ্বির হইলে হয়ত ছু'চার দিনের মধ্যেই একটু আধটু চলিয়া ফিরিয়াও বেড়াইতে পারিবেন !—কিন্তু মারা গিয়াছেন প্রিয়নাথ ! কলতলায় মুখ ধুইতে গিয়া সেই যে হঠাৎ শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িলেন, আর উঠিলেন না ! ডক্তার ডাকা হইয়াছে ; তিনি বলিতেছেন, সন্ন্যাসরোগে পলতাগাঁয়ের জমিদার পরলোকগত হইয়াছেন !

প্রিয়নাথের শ্রাদ্ধের দিন উমেশচন্দ্র নিমন্ত্রণ খাইলেন।—'কর্ত্তা-মা' বেশ নীরোগ হইয়া উঠিয়াছেন, মুখে কথাও ফুটিয়াছে মন্দ নয় ! একখানা লাঠিতে ভর দিয়া সমস্ত আয়োজনের তত্ত্বাবধান নিজেই করিলেন। অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া উমেশচন্দ্রকে বলিলেন, তিনি আসিয়াছিলেন কলুষনাশিনী ভাগীরথীনীরে নিজের দেহাবশেষ সমর্পণ করার জন্য, অথচ তাহার পরিবর্ত্তে আপন সন্তানকে রাখিয়া চলিলেন !—বৃদ্ধা সংস্কৃত জানিতেন না, উমেশচন্দ্রও অবশ্য জানিতেন না, কিন্তু উমেশচন্দ্র শুনিয়াছিলেন একটা কথা, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে,—মনে মনে একবার তাহাই স্মরণ হইল, মুখে কিছু বলিলেন না,—অদূরে পরিচিত এক সংস্কৃতের অধ্যাপক ভোজনে বসিয়াছেন, এবং নিজের সংস্কৃতজ্ঞানকে বিশ্বাস নাই !

অত্যন্ত মৃদুস্বরে, অনেক অশ্রুপাতের মধ্য দিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "আমরা দেশে ফিরছি বাবা, দিন দশ পনেরোর ভেতরেই। —প্রিয়র চিতার ওপর একটা মঠ দিতে চাই, এই ছোটখাট, অল্প

খরচে,—তুমিই করিয়ে দিয়ো বাবা, একটু কমে-সমে, কাল থেকেই আরম্ভ করে' দাও, দেশে ফিরবার আগে যেন দেখে যেতে পারি—"

উমেশচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা, আপনি কিছু ভাব্বেন না, সে সব যা কর্বার আমি আপনার ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করে' করব'খন—"

'কর্ত্তা-মা' কহিলেন, "চার পাশে চারখানা পাথর দিয়ো না বাবা,—পাথর-টাথরের হাঙ্গাম না করাই ভালো, ওসবের বড় দাম। পাঁচ ছেলে আমার, একজনের জন্যেই কি অত খরচ কর্তে আমি পারি, তুমিই বল!—একদিকে একখানা পাথর দিয়ো, বড় করে' লিখে দিয়ো, পল্তাগাঁয়ের জমিদার। অক্ষরগুলো যেন পষ্ট পষ্ট হয়,—মা'র নাম শ্রীনেত্যকালী দেবী, বাপের নাম ৺রামনাথ বাঁড়ুয্যে,—ওরে ভূতো বল্না ভালো করে'—নেত্যকালীটা একটু ডাগর করে' লিখো—"

গঙ্গাতীরে যেখানে চিতার আগুন আকাশপানে উঠিয়াছিল, সেখানে একটি ছোট স্মৃতিস্তম্ভ উঠিল। 'কর্ত্তা-মা' নিজে তদারক করিলেন, কহিলেন, "মাতা শ্রীনৃত্যকালী দেবী" যত বড় অক্ষরে লেখা হইয়াছে, তাহার চেয়ে আরও কিছু বড় হইলেই যেন মানানসই হইত! উমেশচন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি ওটা উঠিয়ে বড় করে' লেখাবারই বন্দোবস্ত কর বাবা, খরচ যা দু' একটাকা বেশী লাগে দেব'খন, ওতে আর হিসেব করে' কি হবে?"

৬

'কর্ত্তা-মা' সকলের সহিত দেশে ফিরিলেন, কালীঘাটে রহিলেন প্রিয়নাথ! বৃদ্ধা যাওয়ার সময় উমেশচন্দ্রকে কহিয়া গেলেন, "তোমার সব টাকা দেশে গিয়েই পাঠিয়ে দেব—"

—বাড়ীভাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া স্মৃতিস্তম্ভের মালমশলার দাম অবধি একটি পয়সাও পাওয়া যায় নাই!—

উমেশচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা—"

দিন কয়েক পরে উমেশচন্দ্রের নামে প্রিয়নাথের মেজ ভাইয়ের নিকট হইতে একখানা পত্র আসিল,—'কর্ত্তা-মা' দেশে পৌঁছিয়াই মারা গিয়াছেন! জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা তাঁহার অপূর্ণ রহিল, কত দুঃখ লইয়াই যে তিনি মরিলেন! —তাঁহার শ্রাদ্ধের ব্যাপারে আবার কতকগুলা টাকা ব্যয় করিতে হইবে, উমেশচন্দ্রের প্রাপ্য টাকা দিতে কিছুদিন বিলম্ব হইতে পারে, তিনি যেন না ত্রুটি গ্রহণ করেন।—

উমেশচন্দ্র সে টাকার কথা ভুলিয়া গেলেন, এবং তাঁহার অপেক্ষা ঢের শীঘ্র ভুলিয়া গেলেন প্রিয়নাথের ভাইয়েরা!

গঙ্গাতীরের সেই স্মৃতিস্তম্ভটি সেদিন হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়িল,—বড় অক্ষরে লেখা, পলতাগাঁয়ের জমিদার, এবং তার চেয়েও বড় অক্ষরে লেখা, মাতা শ্রীনৃত্যকালী দেবী!—অক্ষর এখনও বড়ই, কিন্তু মানুষের অতীত জীবনের অসম্মানের স্মৃতির মত ঝাপসা হইয়া গেছে।

